রাজনীতির আলোচনার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

তুলনামূলক রাজনীতি ঃ

তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা এবং তুলনামূলক রাজনীতি এক নয়। বর্তমানে এদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করা হয়ে থাকে। আগে শুধু শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনাই ছিল তুলনামূলক রাজনীতির বিষয়বস্তু। যার ফলে, শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিই মূলত আলোচ্য হত। কিন্তু, আচরণবাদের প্রভাবে ১৯৫০-এর দশক থেকে প্রতিষ্ঠানের বদলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হতে থাকে। ফলত, সামাজিক প্রক্রিয়াও এখন তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় স্থান পাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বা রাজনৈতিক সংস্কৃতির মতন প্রক্রিয়াগুলিও তুলনামূলক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাক্ষেত্র হয়েছে। আমন্ড (Almond), কোলম্যান (Coleman), পাওয়েল (Powell), ইস্টন (Easton), অ্যাপটার (Apter), একস্টাইন, (Ecktein) প্রমুখ আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের তাত্ত্বিক মডেল নির্মাণের চেষ্টা করেছেন যাতে নির্দিষ্ট

কতকগুলি ধারণার সাহায্যে সব রকমের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। ইস্টনের ব্যবস্থা-বিষয়ক মডেল কিংবা আমন্ড ও তাঁর সহযোগীদের (কোলম্যান, পাওয়েল, লিসিয়েল পাই প্রমুখের) কাঠামো-কার্যবাদী মডেল অথবা কার্ল ডয়েসের যোগাযোগ তত্ত্বের মডেল এই ধরনের মডেলের উদাহরণ।

রাজনীতির মূলকথা সংঘাত (গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, শ্রেণিতে-শ্রেণিতে, কিংবা একদেশের সঙ্গে অন্যদেশের) এবং বাহাতমূলকভাবে বলবৎযোগ্য সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই সংঘাত প্রশমন অথবা নিরসন। সেজন্য অনেকে রাজনীতিকে ক্ষমতার প্রয়োগের প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করে থাকেন। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে কতকগুলি কাঠামো (যেমন, রাজনৈতিক দল), কিছু প্রক্রিয়া (যেমন, নির্বাচন) এবং কিছু রাজনৈতিক ঘটনা (যেমন, বিপ্লব ইত্যাদি)। এগুলিকে বোঝাবার এবং ব্যাখ্যা করবার জন্য যেমন বর্ণনার সাহায্য নিতে হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় তুলনার। সাম্প্রতিককালে টালকট পার্সনস্-এর মডেল অনুসরণ করে উপকরণ (input) (অর্থাৎ পরিবেশ থেকে উত্থাপিত দাবি), কালো বাক্স (Black-Box অর্থাৎ, সরকার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া) এবং উৎপাদকে (অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ (output)) রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের এইসব রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে এবং এদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে চিহ্নিত করা হচ্ছে, যা রাজনীতি সম্পর্কে নানা উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন উত্থাপন করতে এবং তার উত্তর খুঁজতে সাহায্য করে। রাজনৈতিক তত্ত্বের মতো তুলনামূলক রাজনীতিরও লক্ষ্য হল, যতটা সম্ভব প্রাপ্য তথ্যের ভিত্তিতে ওইসব বিষয়ে সূত্র রচনা করা।

ফিলিপ স্মিটার তুলনামূলক রাজনীতি কী তা সংক্ষেপে বলেছেন—"এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি আলোচনা ক্ষেত্র যা নিয়ে পঠনপাঠন ও গবেষণা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে এতে অন্য দেশ বা জনসমষ্টির রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।"[৬] তুলনামূলক রাজনীতির পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে হোল্ট এবং টার্নার মন্তব্য করেছেন যে, তুলনামূলক রাজনীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অস্বচ্ছতা "আগাগোড়াই রয়ে গেছে।"[৬] সে অভিযোগ পুরোপুরি অমূলক নয়। তবে, তা সত্ত্বেও তুলনামূলক রাজনীতির বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করা সম্ভব। সংক্ষেপে বলা যায়, বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও তার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং ঘটনাবলিই তুলনামূলক রাজনীতির বিষয়বস্তু। এবং ওইসব বিষয়বস্তুর তুলনামূলক পর্যালোচনার ভিত্তিতে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলিকে চিহ্নিত করে, প্রকার ভেদ করে এবং কারণ নির্ণয় করে মাঝারি ধরনের অথবা ব্যাপক তত্ত্ব নির্মাণ করা তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনার লক্ষ্য।

(১) তুলনামূলক রাজনীতি ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে গঠিত ধারণা ও প্রত্যয় (Concept) সরবরাহ করে রাজনীতির ব্যাখ্যাকে অনেক সহজ, উন্নত ও বৈজ্ঞানিক হতে সাহায্য করেছে।

(২) তুলনামূলক রাজনীতি বিভিন্ন বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে অবহিত হতে সাহায্য করেছে।

(৩) তুলনামূলক রাজনীতি রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব নির্মাণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে উৎসাহিত করেছে।

(৪) তুলনামূলক রাজনীতি বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বকে যাচাই করে বা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে।

১.৭. তুলনামূলক আলোচনার পদ্ধতি ও প্রকরণ ঃ

তুলনার অর্থ

তুলনা করার অর্থ একই ধরনের দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে মিল ও অমিল খুঁজে বের করা। বিজ্ঞানের আলোচনায় তুলনার এই পদ্ধতির ব্যবহার বিরল নয়। বস্তুত কোনো একটি ঘটনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা নির্মাণ করতে গিয়ে বা কোনো বিষয়ে সংজ্ঞা নির্ধারণ করে তার সীমানা নির্দেশ করতে গিয়ে তুলনার আশ্রয় নিতেই হয়। শুধু বিজ্ঞানের জগতে নয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা প্রতিনিয়ত তুলনার আশ্রয় নিই। কখনও তুলনা স্পষ্ট উচ্চারিত হয় ; কখনও প্রচ্ছন্ন থাকে। যেমন, আমরা যখন তাপমাত্রা বাড়ার কথা বলি বা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের কথা বলি, তখন প্রচ্ছন্নভাবে তুলনার আশ্রয় নিই। তবে রাজনীতির আলোচনাতে স্পষ্ট উচ্চারিত তুলনা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। প্রায়শই এমন বাক্য চোখে পড়ে—"জার্মানির শাসনব্যবস্থা ইটালির শাসনব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশি স্থায়িত্বশীল", বা "পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ়।" এইরকম তুলনা রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর পদ সম্পর্কে, তাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কে, রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বা অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কেও হতে পারে। এগুলি স্পষ্ট উচ্চারিত তুলনার উদাহরণ। পাশাপাশি, এমন অনেক তুলনা দেখা যায় যেগুলি স্পষ্ট উচ্চারিত নয়, প্রচ্ছন্ন তুলনা। যখন বলি, "ভারতবর্ষ একটি অনুন্নত দেশ" তখন প্রচ্ছন্নভাবে ধরে নিই ভারতের অর্থনীতি, সমাজ-কাঠামো, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির তুলনায় কম জটিল বা কম উন্নত।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত নির্দিষ্ট ঘটনা বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুশৃঙ্খলভাবে তুলনার পদ্ধতি ব্যবহার করলে, ব্যবস্থার, ঘটনার বা প্রক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ এবং তত্ত্ব নির্মাণ বা ব্যাখ্যা-প্রকল্প উপস্থিত করা সম্ভব হয়। রাজনীতি বা শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কিত গবেষণা বা আলোচনায় এটিই তুলনামূলক পদ্ধতি বলে পরিচিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার সবক্ষেত্রেই তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যখন একটি দেশের আইনসভার ব্যক্তি-সদস্যদের আচরণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিবৃতিকে পরীক্ষা করে দেখেন তখন সেটা করতে গিয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের আচরণের মধ্যে তুলনা করেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তুলনামূলক আলোচনা

তবে তুলনামূলক রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার আলোচনায় তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যবহার এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যবহারের মধ্যে একটি মূল পার্থক্য আছে। সেটি তুলনীয় বিষয়ের নির্বাচনে। সাধারণভাবে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যে তুলনা করেন তার বিষয়বস্তু অণুস্তরের (micro-level-এর)—যেমন, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, ভোটদাতা,

আইনসভার সদস্য, প্রশাসন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা ইত্যাদি। অন্যদিকে তুলনামূলক রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার আলোচনার একক সার্বিক বা নিখিল স্তরের (macro-level-এর)। অর্থাৎ, তুলনীয় বিষয় হল, বিভিন্ন দেশের সমগ্র শাসনব্যবস্থা বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা। তুলনামূলক রাজনীতিতে আলোচ্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা (Proposition) রচনা করা হয় এবং সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখে গ্রহণ বা বর্জন করা হয়। সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত কোনো একটি কাঠামো বা তার কার্যাবলিও (যেমন রাজনৈতিক দল বা আমলাতন্ত্র) তুলনামূলক রাজনীতির আলোচ্য হতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে আলোচনা করতে হয় সমগ্র ব্যবস্থাটির পরিপ্রেক্ষিতে।

গবেষণা প্রকরণ

তুলনামূলক রাজনীতির গবেষণায় যেসব প্রকরণ বা টেকনিকের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে, তা মূলত তিন ধরনের। প্রথমটি, "কেস স্টাডিজ"। অর্থাৎ, বিশেষ একটি দেশ বা ব্যবস্থার বিশ্লেষণ। তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে এই ধরনের আলোচনা মূল্যবান। কেন না, কোনো একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বা কোনো একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সাধারণ সূত্র নির্মাণ করতে হলে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই প্রক্রিয়াটি বা প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে জানা। যেমন, আমরা যদি সাধারণভাবে রাজনৈতিক দল কীভাবে কাজ করে জানতে চাই, তাহলে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দল ও তাদের ভূমিকা অনুসন্ধান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় যে গবেষণা প্রকরণ তুলনামূলক রাজনীতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেটি পরিসংখ্যান-ভিত্তিক আলোচনা। বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে প্রাপ্য তথ্যের ভিত্তিতে সেইসব দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। তৃতীয় প্রকরণটি, একদিকে বিশেষ দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ এবং অন্যদিকে বহু দেশ থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের সাহায্যে তুলনামূলক আলোচনা, এই দুই-এর মাঝামাঝি। খুব কম সংখ্যক দেশের—প্রায়শই দুটি বা তিনটি দেশের—রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোনো একটি দিকের তুলনামূলক আলোচনা এই গবেষণা প্রকরণের বৈশিষ্ট্য।

তুলনামূলক আলোচনার বিভিন্ন স্তর

ডেভিড উড (David M. Wood) তুলনামূলক পদ্ধতির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনটি স্বতন্ত্র কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, প্রথমত, যেসব রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপাদান আলোচ্য সেগুলির মধ্যে কোনো-না-কোনো মিল বা সাযুজ্য থাকতে হবে। কোনোরকম মিল না থাকলে কখনোই দুটি বিষয় তুলনীয় হতে পারে না। এমনকি তুলনামূলক আলোচনার লক্ষ্য যখন পার্থক্যকে তুলে ধরা, তখনও। দ্বিতীয়ত, তুলনামূলক বিশ্লেষণের শুরুতেই বিষয়টির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করতে হয়। যেমন, যদি একটি মানুষের সঙ্গে একটি গাছের তুলনা করতে হয়, তাহলে প্রথমেই দেখতে হবে উভয়ের মধ্যে মিল কোথায়। গাছের সঙ্গে মানুষের মিল হল উভয়েই পরিবেশ থেকে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে। এই মিলটিকে চিহ্নিত করতে পারলে তবেই তার ভিত্তিতে রসদ সংগ্রহের প্রক্রিয়ার পার্থক্যকে তুলে ধরা যায়। একইভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং চিনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে হলে প্রথমেই চিহ্নিত করতে হয় মিলটিকে—যেমন, উভয় ব্যবস্থাই সমগ্র সমাজে মূল্যবান বস্তুর কর্তৃত্বমূলক বণ্টনের কাজে নিয়োজিত। একেই উড বলেছেন, conceptual unit। এটিকে চিহ্নিত করতে পারলে তখনই কীভাবে দুটি ভিন্ন ব্যবস্থা কর্তৃত্বপূর্ণ বরাদ্দ করছে তার পার্থক্যকে ধরা যায় এবং তার ভিত্তিতে ব্যবস্থার শ্রেণিবিভাজন করা সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, তুলনার বিষয়কে চিহ্নিত করা ও তার সংজ্ঞা নিরূপণ করার (উড একে definition of conceptual unit বলেছেন) সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার জন্য আবশ্যক নির্দিষ্ট

মাপকাঠির, যার সাহায্যে একইরকম ঘটনার বা ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যকে তুলে ধরা যায়। বিভিন্ন মাপকাঠির সাহায্যে গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থা, সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতি পরিচালিত ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণিবিভাজন সম্ভব হয়। সবশেষে, তুলনীয় বিষয়গুলির (conceptual unit-এর) সংজ্ঞার্থ নিরূপণ এবং শ্রেণিবিভাজন, এই দুটি পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন উত্থাপন করতে হয় এবং তার উত্তর অনুমান করে সেগুলি ঠিক না-ভুল পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে স্বীকৃত। অধ্যাপক সি. এফ. স্ট্রং-এর মতে "বিশ্বের সব থেকে সম্পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান" হল মার্কিন সংবিধান। শুধু স্ট্রং বা হোয়ারই নন, পশ্চিমি বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে আদর্শ বা মডেল বলে মনে করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হল পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যান্য দেশের যুক্তরাষ্ট্রগুলি মার্কিন আদলেই গড়ে উঠেছে, মার্কিন সংবিধান রচয়িতারা যেমন শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন তেমনি অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যকেও অস্বীকার করেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্যগুলিই বিদ্যমান। সেগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি স্তরের সরকার আছে। জাতীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার এবং পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্যের সরকার। উভয় সরকারের ক্ষমতা সংবিধানে নির্দিষ্ট। দেশের সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত এবং অন্যান্য বিষয়ে রাজ্যগুলি স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে। জাতীয় সরকার ও রাজ্য সরকার—উভয়ের ক্ষমতার উৎস যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান।

দ্বিতীয়ত, মার্কিন সংবিধান সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দিয়েছে। যেভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে তার কয়েকটি

বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। (ক) সংবিধানের ১নং ধারায় জাতীয় সরকারকে অর্থ, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এগুলিকে সংবিধানে অর্পিত ক্ষমতা বলা হয়। (খ) 'অর্পিত ক্ষমতা' ছাড়া জাতীয় সরকারের আর এক ধরনের ক্ষমতা আছে সেগুলিকে বলা হয় 'অনুমিত ক্ষমতা'. সংবিধানের এই ব্যবস্থা অনুসারে কংগ্রেস ইচ্ছে করলেই যে-কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে না। কিন্তু, কংগ্রেসকে প্রদত্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এবং শাসন ও বিচারবিভাগকে প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষমতা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন ও সঙ্গত মনে করলে জাতীয় সরকার যে-কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকারী। (গ) সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে বলা থাকলেও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা নির্দিষ্ট করা নেই। সংবিধানের ১০নং সংশোধনীতে বলা হয়েছে সংবিধান যেসব ক্ষমতা কেন্দ্র সরকারকে অর্পণ করেনি, সেসব ক্ষমতা রাজ্যগুলির জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এগুলিকেই "অবশিষ্ট ক্ষমতা" বলে। (ঘ) এছাড়াও আরও কিছু বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয়েই ক্ষমতা ভোগ করে. যেগুলি "যুগ্ম ক্ষমতা" বলে পরিচিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্রষ্টা সংবিধান, তাই শাসন, আইন ও বিচার সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা সংবিধান প্রদত্ত, সংবিধানের অধীন এবং সংবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিচার বিভাগের প্রাধান্য। সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা, অভিভাবক ও সংরক্ষক হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট জাতীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির যে-কোনো কাজ বা আইনকে সংবিধান বিরোধী বা অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। "বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা" প্রয়োগের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট জাতীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনে ভারসাম্য রক্ষা করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অস্তিত্বের স্বার্থে মার্কিন সংবিধানকে রাজ্যগুলির সম্মতি ব্যতীত সংশোধন করা যাবে না। সংশোধন সংক্রান্ত এই জটিল ও কঠিন পদ্ধতি মার্কিন সংবিধানকে অত্যন্ত দুষ্পরিবর্তনীয় করে তুলেছে।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে যেহেতু রাজ্যগুলি সার্বভৌম ও স্বাধীন ছিল কাজেই রাজ্যের অধিকার সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থাও সংবিধানে উল্লিখিত আছে। যেমন, রাজ্যগুলির নিজস্ব সংবিধান আছে, তবে শাসনব্যবস্থা অবশ্যই সাধারণতান্ত্রিক হবে। রাজ্যগুলির সম্মতি ব্যতীত মার্কিন সংবিধান সংশোধন করা যাবে না। এছাড়া কোনো রাজ্য যেমন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে না, তেমনি জাতীয় সরকার রাজ্যগুলির সীমানার পুনর্গঠন বা পরিবর্তন ঐ রাজ্যের আইনসভার সম্মতি ব্যতীত করতে পারবে না। তবে রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কতকগুলি বাধানিষেধও দেখা যায়, যেমন (ক) কোনো

রাজ্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করতে, জোটভুক্ত হতে অথবা রাষ্ট্র সমবায় গঠন করতে পারবে না, (খ) রাজ্য সরকার টাকা ছাপতে বা ঋণপত্র ছাড়তে পারবে না, (গ) কেন্দ্রীয় আইনসভার সম্মতি ব্যতীত নিজস্ব সৈন্যবাহিনী অথবা নৌবাহিনী গঠন করতে বা রাখতে পারবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনে বা জনসংখ্যায় পার্থক্য যাইহোক না কেন, মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে সকল রাজ্যের সমপ্রতিনিধিত্ব থাকবে। মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থায় দ্বৈত নাগরিকতা হল আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একজন মার্কিনি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নাগরিক নন, যে রাজ্যের অধিবাসী তারও। তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েরই অধীন এবং উভয়ের প্রতিই তাঁর আনুগত্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বর্তমানে আদর্শ যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে অনেকে মেনে নিতে চান না। সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে এককেন্দ্রিকতার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির সূচনা উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হলেও বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে তা আরো পরিণতি লাভ করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিবর্তন

১৭৮৭ সালে গৃহীত সংবিধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করা হয়েছিল বিগত দুশো বছরেরও বেশি সময়কালে সেটি অপরিবর্তিত চরিত্রের থাকেনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। সময়ের মাপকাঠিতে সেই পরিবর্তনগুলি নিম্নরূপ—

১. অঙ্গরাজ্য-কেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা (State-centric Federalism) (১৭৮৭-১৮৬৮)

১৭৮৭-১৮৬৮-র মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতার প্রাধান্য লক্ষ করা গিয়েছিল, যার মূল কারণ হল এই সময়ে জাতীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতায় আসেনি, কিন্তু অঙ্গরাজ্যগুলিতে সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতায় প্রথম সীমারেখা টানল ১৮৬৮ সালের সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন, যা রাজ্যগুলিকে আদেশ দিল যে তারা এমন কোনো আইন প্রণয়ন বা প্রয়োগ করবে না যার দ্বারা কোনো মার্কিন নাগরিকের প্রাধিকার খর্ব হয়। এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকতা রাজ্যগুলির নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে সাংবিধানিকভাবে মুক্তি পেল।

২. দ্বৈত যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা (Dual Federalism) (১৮৬৮-১৯১৩)

দ্বৈত যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় ও রাজ্য সরকারগুলি যে যার নিজের ক্ষমতার এলাকায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকে, যাকে "Layer-cake federalism" বলে অভিহিত করা হয়েছে। মার্কিন গৃহযুদ্ধের অবসানের পর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতার এলাকা ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করলেও, রাজ্যগুলির ক্ষমতা প্রায় অপরিবর্তিত থেকেছে।

৩. সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা (Cooperative Federalism) (১৯১৩-১৯৬৪)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিবর্তনের এই স্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় ১৯১৩ সালের ষষ্ঠদশ সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে। ঐ সংশোধন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে আয়কর সংগ্রহের ও ঐ রাজস্বের কোনো অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে না বণ্টন করার কথা বলে। তবে, ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৩০-র দশকের অর্থনৈতিক মন্দা, ১৯৩৯-৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তী ঠান্ডা লড়াই-এর পরিস্থিতি জাতীয় সুরক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণকর কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে সহযোগীতার পরিস্থিতি গড়ে তোলে। "Marble-cake federalism" নামে পরিচিত হয়েছে এই যুগের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।

৪. কেন্দ্রীভূত যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা (Centralized Federalism) (১৯৬৪-১৯৮০)

১৯৬৪ সালে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী লিন্ডন বি. জনসন মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন, মার্কিন কংগ্রেসের দুটি কক্ষেও ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। আইনবিভাগের পূর্ণ সমর্থনকে শক্তি করে রাষ্ট্রপতি জনসন একাধিক সমাজকল্যাণকর কর্মসূচি গ্রহণ করেন, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জাতিগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ। অনেকগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় অনুদান দেওয়া হতে থাকে, যেগুলির উপর অনেকক্ষেত্রেই রাজ্যসরকারগুলির কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। মার্কিন রাজনীতির কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এই সময়ের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে "Creative Federalism" বা "সৃষ্টিশীল যুক্তরাষ্ট্র' বলেও অভিহিত করেছেন। তবে, ষাটের দশকের মধ্য থেকে শুরু হওয়া ভিয়েতনাম যুদ্ধ স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু, অন্যদিকে, ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শোচনীয় ও অপমানজনক পরাজয়, বিশ্বজোড়া তেল সংকট ও তার ফলশ্রুতি স্বরূপ অর্থনৈতিক মন্দা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মর্যাদা অনেকাংশে হ্রাস করে এবং সেই পরিস্থিতিতে অঙ্গরাজ্যগুলি তাদের ক্ষমতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়।

৫. নয়া যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা (New Federalism)

১৯৭০-এর দশক থেকেই রিপাব্লিকান দল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা হ্রাস ও রাজ্যগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির সমর্থনে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। ১৯৮০-এর নির্বাচনে রিপাব্লিকান প্রার্থী রোনাল্ড রেগান রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়ার পর কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। শুরু হয় 'নয়া যুক্তরাষ্ট্রের' যুগ। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আকার ক্ষুদ্রতর করা হয় ও ধনীদের ওপর থেকে আয়করের হার হ্রাস করা হয়, যা ছিল এক প্রকারের নয়া-সংরক্ষণবাদী (Neo-Conservative) রাজনীতির প্রতিফলন।

৬. বাধ্যকারী যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা (Coercive Federalism) (১৯৮৫-)

১৯৮৫ সালে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি গার্সিয়ার রায় ('Garcia Decision') প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যগুলির ক্ষমতার এলাকায় হস্তক্ষেপ করে। এই বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পক্ষে রাজ্যের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার পথে প্রায় সকল বাধাকেই অপসারণ করে দেয়। সুপ্রিম কোর্টের মতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের রাজ্যের এলাকায় হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতার সীমা নির্ভর করে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ওপর। পরবর্তীকালে, ১৯৯০-এর দশকে, মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত Contract with America, Unfunded Mandates Reform Act, Health Insurance Portability and Accountability Act, Balanced Budget Act ও বিভিন্ন প্রকারের কেন্দ্রীয় অনুদান-নির্ভর সমাজকল্যাণকর কর্মসূচি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিপুলহারে বৃদ্ধি করে। ১৯৯০ সালে, অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি লোপেজ-এর রায় (Lopez Decision) গার্সিয়ার রায়ের বিরুদ্ধে মত দেয় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করার আদেশ রাজ্যের পুলিশবিভাগীয় ক্ষমতার এলাকাতেই হস্তক্ষেপ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এই ইতিহাস পাঠ থেকে এটি যথেষ্টই স্পষ্ট যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছিল, কখনও বা অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলির সহযোগিতায় আর কখনও বা, সেই সহযোগিতা নির্বিশেষে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধি একাধিক কারণে ও একাধিক পথে হয়েছে। কারণগুলি ছিল কখনও অর্থনৈতিক, কখনও রাজনৈতিক-সামরিক ও কখনও বা সামাজিক প্রয়োজনদ্ভূত। অন্যদিকে, ঐ ক্ষমতাবৃদ্ধি কার্যকরী হয়েছিল

ক্ষেত্রবিশেষে দেশের শীর্ষ আদালতের রায়, আইনসভা-প্রণীত আইন, বা সরকারি আদেশের মাধ্যমে।

এগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় বিভিন্ন সময়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রদত্ত রায়ের কথা। বহু মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রায়দান করে সুপ্রিম কোর্ট ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। এছাড়া অনুমিত ক্ষমতার সাংবিধানিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করে সুপ্রিম কোর্ট জাতীয় প্রাধান্য সমর্থন করেছে এবং জাতীয় কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মামলায় রায় দিতে গিয়ে কৃষি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শ্রম প্রভৃতি বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে রাজ্যের হাত থেকে কেন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েছে।

ক্রমাগত অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দা এবং তার জন্য স্থায়ী বেকারত্ব, দায়িত্ব, সমাজের কোনো কোনো অংশের প্রতি সামাজিক অন্যায় বৈষম্য এবং ব্যবসায়িক জগতে দুর্নীতি ইত্যাদি জাতীয় সরকারকে শক্তিশালী করেছে। আর্থিক সংকট ও আর্থিক অনুদানের মাধ্যমেও যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে বলে মনে করা হয়। ১৯৩০ সালের Great Depression-র পর ক্ষমতার ভারসাম্য কেন্দ্রের অনুকূলে চলে যায়। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের "New Deal" ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এসময় রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল। স্যামুয়েল বিয়ারের ভাষায়—"Roosevelt's nationalism was a doctrine of federal centralization"।

আর্থিক সংকট ছাড়াও বিভিন্ন আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রেও রাজ্যগুলি কেন্দ্র মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। আর কেন্দ্রের অনুদানের ওপর ভিত্তি করে যে প্রকল্পগুলি রচিত হয় সেগুলির কাজকর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকে। ২০০৮-০৯ সালের যে অর্থনৈতিক মন্দা মার্কিন অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে তার মোকাবিলা করতে গিয়ে মার্কিন কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধরনের মন্দার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেইজন্য বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাগ্রহণে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রাথমিক দায়িত্বের কথা রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা স্বীকার করে নিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীকরণের একটি কারণ যুদ্ধ। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ঠান্ডা লড়াইয়ের পরিবেশ, আন্তর্জাতিক সংকট, আণবিক মারণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। নব্বই-এর দশকে ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনায় মার্কিন কংগ্রেস মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে 'মিত্র বাহিনী'র নেতৃত্বদানে ক্ষমতা প্রদান করে। সাম্প্রতিককালে তালিবান সরকারের বিরুদ্ধে ও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আল কায়দা-কে দমন করার জন্য সর্বাত্মক সামরিক অভিযান পরিচালনায় মার্কিন কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি বুশকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করে

এমনকি ২০০৩ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর জন্য মার্কিন কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত বাজেট অনুমোদন করে। তাই কে. সি. হোয়ারকে সমর্থন করেই বলতে হয়—"War and economic crisis, if they recur frequently, will almost certainly turn federal governments into unitary governments."

এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যমগুলি, যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থা সর্বোপরি বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ার, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিকাশ এমন স্তরে এসে পৌঁছেছে, যখন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক যে-কোনো সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্র পর্যাপ্ত সাংবিধানিক কর্তৃত্বের অধিকারী।

৩.১. ব্রিটেনের সংবিধান ও শাসনব্যবস্থার মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

সংবিধান মানে শাসনব্যবস্থা নয়। সংবিধান কতকগুলি আইন, প্রথা এবং রীতিনীতির সমষ্টি ; এক অর্থে শাসনব্যবস্থার আইনগত রূপ। সব রাষ্ট্রেই যেমন কোনো-না-কোনো ধরনের শাসনব্যবস্থা থাকে, তেমনি থাকে সংবিধান। নির্দিষ্ট একটি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি সংবিধানে ধরা থাকে। আমরা এগুলিকেই সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করি। এ ছাড়া থাকে, সংবিধানের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যও—যেমন, এটি একটি দলিল আকারে লিখিত বা অলিখিত, সুপরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় ইত্যাদি। সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় এই দু-ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথাই বলা হয়। ব্রিটিশ সংবিধান ও শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ঃ

গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যান্ডের যুক্তরাজ্য (যেটি সংক্ষেপে ব্রিটেন নামে পরিচিত) ইংল্যান্ড, আয়ার্ল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস্‌কে নিয়ে গঠিত। কিন্তু ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। ব্রিটেনের সংবিধানও এককেন্দ্রিক সংবিধানের উদাহরণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা রাষ্ট্রসমবায়ের সংবিধান থেকে এই সংবিধানের পার্থক্য সুস্পষ্ট। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের মতন ব্রিটেনে একাধিক সরকার নেই। সংবিধান অনুসারে আইন ও শাসনবিষয়ক ক্ষমতা একটিমাত্র কেন্দ্রে বা একটি মাত্র সরকারেই ন্যস্ত। শাসনের সুবিধের জন্য অবশ্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংস্থা আছে। এই ধরনের সংস্থার ক্ষমতার উৎস ব্রিটেনের পার্লামেন্ট। পার্লামেন্ট চাইলে ক্ষমতা কেড়ে নিতেও পারে। পার্লামেন্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তবে, শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক হলেও স্কটল্যান্ড, ওয়েলস প্রভৃতি অঞ্চল অনেকটা স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে। এদের আলাদা প্রতিনিধিসভা, আইনব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি আছে। সাম্প্রতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের (ডিভল্যুশনের) ফলে এই অঞ্চলগুলি এখন অনেকটাই স্বাধীন ক্ষমতা ভোগ করে। এই ক্ষমতার উৎস সংবিধান নয়। সংবিধানে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়নি। সংসদে আইন রচনা করে এদের ক্ষমতার ক্ষেত্র নির্ধারিত হয়েছে। সংবিধান অনুসারে সব ক্ষমতাই একটি কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয়।

টেনের
সনব্যবস্থা
ককেন্দ্রিক

(২) অলিখিত সংবিধান :

অধিকাংশ আধুনিক রাষ্ট্রেরই সংবিধান লিখিত দলিল আকারে পাওয়া যায়, ব্রিটেনে এই ধরনের কোনো সাংবিধানিক দলিল নেই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ বা অন্যান্য রাষ্ট্রের সংবিধানের মতো বিশেষভাবে আহূত কোনো পরিষদের দ্বারা ব্রিটেনের সংবিধান কখনও রচিত হয়নি। ব্রিটেনের সংবিধান বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ১০৬৬ সালে নর্মান রাজা (নর্ম্যান্ডির ডিউক) উইলিয়াম যখন ব্রিটেন জয় করেন তখন সংবিধান ছিল প্রচলিত নিয়মকানুনের সমষ্টি। ১১৬৪ সালে রাজা দ্বিতীয় হেনরি এই ধরনের কতকগুলি নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করেছিলেন ; এগুলি "কনস্টিটিউশনস অফ ক্ল্যারেনডন" (Constitutions of Clarendon) নামে পরিচিত। এরপর সপ্তদশ শতাব্দীতে গৃহযুদ্ধের পরে ১৬৫৩ সালে ক্রমওয়েল একটি শাসনবিষয়ক নিয়মাবলি (Instruments of Government) রচনা করেছিলেন। ওই একবারই ব্রিটেনে একটি সংবিধান রচিত হয়েছিল, কিন্তু তা মাত্র সাত বছর পরেই, ১৬৬০ সালে, রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অবলুপ্ত হয়। এর পরে আর ব্রিটেনে কখনোই সংবিধান রচনার চেষ্টা হয়নি। ১৯৭০-এর পর থেকে বারবার অনেকে লিখিত আকারে সংবিধান প্রবর্তনের দাবি জানিয়েছেন, কিন্তু আজ অবধি তা যথেষ্ট জনসমর্থন পায়নি।

লিখিত দলিল আকারে সংবিধান অপ্রাপ্য

লিখিত দলিল আকারে নেই বলেই ব্রিটেনের সংবিধানকে সাধারণত 'অলিখিত' আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু, এর অর্থ এই নয় যে, ব্রিটেনের সংবিধানের কোনো কিছুই লিখিত নয়। ব্রিটেনের সাংবিধানিক আইনকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, তা তিন ধরনের আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির সমষ্টি। তিন ধরনের আইন হল—পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন বা স্ট্যাটিউট ল, প্রচলিত আইন বা বিচারপতি-প্রণীত আইন (কমন ল) এবং প্রথা, বিশেষ করে পার্লামেন্ট বা সংসদ-সংক্রান্ত প্রথা। এর মধ্যে পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন এবং বিচারপতি-প্রণীত আইন লিখিত আকারে প্রাপ্য। এ ছাড়াও কিছু সনদ ইত্যাদি আছে যেগুলি ব্রিটিশ সংবিধানের অঙ্গ এবং লিখিত অঙ্গ।

(৩) সুপরিবর্তনীয় সংবিধান :

ব্রিটিশ সংবিধান যেমন অলিখিত, তেমনি অলিখিত বলেই সুপরিবর্তনীয়। সুপরিবর্তনীয় বলার অর্থ—ব্রিটেনের সংবিধানের যে কোনো নীতি অথবা আইন রানি ও তাঁর পার্লামেন্ট বা সংসদের দ্বারা সহজেই পরিবর্তিত হতে পারে। পরিবর্তন সাধন করা যায় সাধারণ আইন পাস করার পদ্ধতিতে সংসদে আইন পাস করে, কোনো বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। এর তাৎপর্য তিনটি—**প্রথমত**, ব্রিটেনের সাংবিধানিক আইন এবং সংসদ-প্রণীত সাধারণ আইনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যে সংসদ সাধারণ আইন প্রণয়ন করে সেই সংসদই একই পদ্ধতিতে সাংবিধানিক আইনও রচনা করতে পারে ; সাংবিধানিক আইন রচনার জন্য কোনো স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নেই। **দ্বিতীয়ত**, ব্রিটেনে সংসদ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ; সংসদের ক্ষমতা সংবিধানের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, বরং সংবিধান সংসদের ক্ষমতার অধীন। **তৃতীয়ত**, যেহেতু সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংবিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট নয় এবং সংসদ যে কোনো সময়ে অনায়াসে সাংবিধানিক আইনকে পরিবর্তিত বা সংশোধিত করতে পারে, সেজন্য সংসদ-প্রণীত কোনো আইনকে পুনর্বিচার করে দেখার বা অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করার ক্ষমতা ব্রিটেনের বিচারালয়ের নেই।

সংবিধান সহজেই পরিবর্তন করা যায়

ব্রিটেনের সংবিধানের এই সুপরিবর্তনীয় চরিত্র সংবিধান অলিখিত হওয়ার ফলেই হয়েছে।

(৪) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট বা সংসদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা :

ব্রিটেনের সাংবিধানিক আইন বিষয়ে অন্যতম বিশেষজ্ঞ ও. হুড ফিলিপস (O. Hood Phillips) এটিকে ব্রিটিশ সাংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। ডাইসি একেই সংসদ বা পার্লামেন্টের "সার্বভৌমত্ব" বলেছেন। ডাইসির মতে, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার দুটি প্রধান স্তম্ভের একটি পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব, অপরটি আইনের অনুশাসন।

সংসদের ক্ষমতা

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের অর্থ—(১) পার্লামেন্ট যে কোনো আইন রচনা করতে কিংবা যে কোনো আইনকে বাতিল করতে পারে ; এবং (২) পার্লামেন্ট প্রণীত কোনো আইনের বৈধতা বিচার করার বা বিচারবিভাগীয় পুনর্বিচারের ক্ষমতা কোনো আদালতের নেই। পার্লামেন্টের এই ক্ষমতা কোনো আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। ডাইসি যেভাবে এই ক্ষমতার বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় পার্লামেন্টের এই সর্বোচ্চ ক্ষমতার একটি ইতিবাচক ও একটি নেতিবাচক দিক আছে। ইতিবাচক দিকে সংসদ ইচ্ছে করলে বা প্রয়োজন বোধ করলে আইনানুসারেই যে কোনো বিষয়ে যে কোনো ধরনের আইন রচনা করতে পারে। নেতিবাচক দিকে ব্রিটেনে এমন অন্য কোনো সংস্থা, ব্যক্তি বা কর্তৃত্ব নেই, যা সংসদের মতন সমগ্র ব্রিটেনে প্রযোজ্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভোগ করে কিংবা সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার ওপর কোনোভাবে সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে।

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব

ব্রিটেনের সংবিধানে সংসদকে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই যে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, বস্তুত এটিই একমাত্র মৌলিক সাংবিধানিক নির্দেশ যা পরিবর্তিত করার ক্ষমতা সংসদেরও নেই।

তবে, বর্তমানে বাস্তব রাজনীতিতে দেখা যাচ্ছে সংসদের এই ক্ষমতার কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন—জনমতের চাপে, স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাবে কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো প্রভৃতির জন্য সংসদের এই ক্ষমতা কিছুটা সংকুচিত হয়েছে।

(৫) সাংবিধানিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র :

ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক। কিন্তু চরম অথবা শক্তিশালী রাজতন্ত্র নয়। ব্রিটেনের রাজতন্ত্র সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের বা সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের উদাহরণ। এর অর্থ—বাহ্যত সব শাসনক্ষমতা আইনানুসারে রাজা বা রানির ওপর ন্যস্ত, কিন্তু কার্যত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয় আইন, প্রথা ও সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুসরণ করে। শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করেন রাজা বা রানি তাঁর মন্ত্রীদের পরামর্শমতো কিংবা মন্ত্রীরা রাজা বা রানির নামে। এমনকি, রাজা বা রানির বিশেষ ক্ষমতা বা প্রেরোগেটিভ-এর ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্যকর।

রাজতন্ত্র সীমাবদ্ধ

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্র যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার ফলেই ব্রিটেনে এই সীমাবদ্ধ রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ওই শতাব্দী থেকেই রাজার নিজের বা তাঁর প্রতিনিধি মারফত, প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনার অবসান ঘটে। সাংবিধানিক রীতিনীতির দ্বারা পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হয়েছে।

(৬) দায়িত্বশীল সংসদীয় শাসনব্যবস্থা :

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা সংসদীয়। এটি "ওয়েস্টমিনস্টার মডেল" নামে পরিচিত। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অর্থ এই নয় যে, সংসদ বা পার্লামেন্ট প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনা করে। সংসদ শাসন করে না, শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদীয় ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য

সংসদীয় বা মন্ত্রীসভা চালিত শাসনব্যবস্থা

হল, এই ব্যবস্থায় সরকারের সব বিভাগই চূড়ান্তভাবে সংসদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সংসদ একদিকে আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করে, অপরদিকে শাসনকার্য পরিচালনায় যাঁরা নিযুক্ত থাকেন—প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা—তাঁদের কাজকর্মের ওপর নজরদারি করে। সংসদ অর্থ-সংক্রান্ত সবকিছুকেও নিয়ন্ত্রণ করে। আংশত আইন,আংশত প্রথা এবং অংশত সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ব্রিটেনের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনা করে মন্ত্রীরা, সেজন্য একে মন্ত্রীসভা-চালিত শাসনব্যবস্থাও বলা হয়ে থাকে। ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীসভাই প্রকৃত শাসনকর্তা।

মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা

ব্রিটেনের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য দায়িত্বশীলতা। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনা করে মন্ত্রীসভা। মন্ত্রীসভা সংসদের দ্বারা নির্বাচিত হয়। মন্ত্রীসভার সব সদস্যকেই সংসদের সদস্য হতে হয়। সমগ্র মন্ত্রীসভা এবং ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রীরা তাঁদের সব কাজকর্মের জন্য সংসদের কাছে, বিশেষ করে নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্স বা কমন্সসভার কাছে, দায়িত্বশীল থাকেন। যতদিন তাঁরা কমন্সসভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিনই মন্ত্রীপদে বহাল থাকতে পারেন। কমন্সসভা অনাস্থা জ্ঞাপন করলে মন্ত্রীসভাকে বা বিশেষ মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের নির্দিষ্ট রূপ

দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের একটি নির্দিষ্ট রূপ। ব্রিটেনের দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসনকর্তা, মন্ত্রীসভা, প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বশীল থাকে সংসদের, মূলত কমন্সসভার কাছে এবং কমন্সসভার মাধ্যমে পরোক্ষে জনসাধারণের কাছে বা নাগরিকদের কাছে, কেন না, কমন্সসভা নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। মন্ত্রীসভায় গৃহীত কোনো কর্মসূচি কমন্সসভা প্রত্যাখ্যান করলে কিংবা কমন্সসভা মন্ত্রীসভা সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশ করলে মন্ত্রীসভা নতুন করে সমর্থন পাওয়ার জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারস্থ হতে পারে।

(৭) উদারনৈতিক গণতন্ত্র :

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

ব্রিটেনের দায়িত্বশীল সংসদীয় শাসনের ভিত্তি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। উদারনৈতিক গণতন্ত্র শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলি ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দেখা যায়, সেগুলি—(ক) একাধিক রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন ধরনের স্বেচ্ছামূলক স্বার্থ-গোষ্ঠীর উপস্থিতি ; (খ) সার্বিক ভোটাধিকার ; (গ) রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা ; (ঘ) আইনসভায় বিরোধীদলের পূর্ণ স্বীকৃতি ; (ঙ) শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পদাধিকারীর ক্ষমতার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ও আইনগত নিয়ন্ত্রণ ; (চ) ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ; (ছ) গণ সংবাদ-মাধ্যমগুলির স্বাধীনতা ; এবং (জ) গণসার্বভৌমত্বের নীতির ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থার বৈধকরণ।

(৮) সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির বিশেষ গুরুত্ব :

সাংবিধানিক রীতিনীতির গুরুত্ব

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বলতে শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অলিখিত নিয়মাবলিকে বোঝায়। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি আইনের মতো বিধিবদ্ধ থাকে না এবং আইনের মতো আদালতে বলবৎযোগ্যও নয়, কিন্তু শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সবাই এইসব নিয়মাবলিকে মেনে চলেন। যেসব দেশে সংবিধান লিখিত সেসব দেশেও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি কিংবা রাষ্ট্রপতির দ্বারা মন্ত্রীপরিষদের

নিয়োগের পদ্ধতি অনেকটাই শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ করে। তবে, ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় এই ধরনের রীতিনীতির গুরুত্ব তুলনায় অনেক বেশি। এর **একটি কারণ**, ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। **দ্বিতীয় কারণ**, ব্রিটেনের জনসাধারণ কখনোই সরকার পরিচালনার নিয়মকানুনকে আইনের মতো বিধিবদ্ধ রূপ দিতে উৎসাহবোধ করেনি। যেমন, ১৬৮৮-র বিপ্লবের পরে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, সেগুলিকে আইনের রূপ দেওয়া হয়নি।

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা কীভাবে ক্রিয়াশীল থাকে তা ব্যাখ্যা করতে এবং ব্রিটেনের সংবিধানের পরিবর্তন ও বিকাশ কীভাবে ঘটেছে তা বুঝতে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে লক্ষ করতে হয়। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসারে। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির আর-একটি কাজ হল, শাসনব্যবস্থার কাঠামো ও কার্যাবলির মধ্যে অভিযোজন ঘটানো, অর্থাৎ, অন্যভাবে বললে, কার্যাবলির সঙ্গে সংগতি রেখে শাসনব্যবস্থার কাঠামোতে পরিবর্তনসাধন। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় বিগত তিনশো বছরে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে তার মূলে আছে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির এই ভূমিকা। যেমন—১৬৮৮ সালের আগে ব্রিটেনে রাজতন্ত্র ছিল শক্তিশালী, কিন্তু এখন ব্রিটেনের রাজতন্ত্র সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রে পরিণত হয়েছে, পাশাপাশি গড়ে উঠেছে মন্ত্রীসভা-পরিচালিত দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা—এই পরিবর্তন শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মাধ্যমেই ঘটেছে, আইন করে নয়। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিকে তাই ব্রিটেনের সংবিধানের অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলা যায়।

(৯) আইনের অনুশাসন

ডাইসি তাঁর Law of the Constitution বই-এ ব্রিটিশ সংবিধানের তিনটি বৈশিষ্ট্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। **এর একটি**, সংসদ বা পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। **দ্বিতীয়টি**, আইনের অনুশাসন। এবং **তৃতীয়টি**, সাংবিধানিক রীতিনীতি।

আইনের অনুশাসনের ধারণাটি কিছুটা অস্পষ্ট। নানাভাবে এর অর্থ করা যায়। তবে ডাইসি তিনটি সুস্পষ্ট অর্থে আইনের অনুশাসনকে ব্রিটিশ সংবিধানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। সেই তিনটি অর্থ হল—

আইনের অনুশাসনের অর্থ—

(ক) আইনের চূড়ান্ত প্রাধান্য। অর্থাৎ, কেউই স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী নয়। কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়। এবং আইন ভঙ্গ করার সুস্পষ্ট অপরাধ সাধারণ আদালতে সাধারণ পদ্ধতিতে প্রমাণিত না-হওয়া পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না।

(খ) আইনের চোখে সবাই সমান। অর্থাৎ, প্রতিটি ব্যক্তিকে, তাঁর মর্যাদা বা অবস্থা যাই হোক না কেন, দেশের সাধারণ আইন মেনে চলতে হয়। সে কোনো আইন ভঙ্গ করলে বা অপরাধ করলে বিচার হবে সাধারণ আদালতে।

(গ) ব্যক্তির স্বাধীনতার—যেমন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা মতপ্রকাশের কিংবা সভাসমিতি করার স্বাধীনতার—উৎস সাংবিধানিক আইন নয়, তা আদালতের দ্বারা নির্ধারিত ও বলবৎ হয়। সাংবিধানিক আইন তার থেকেই গড়ে উঠেছে।

ডাইসি তাঁর তত্ত্বে যেভাবে আইনের অনুশাসনকে ব্যাখ্যা করেছেন তা নিয়ে তর্ক আছে। আইভর জেনিংস ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা ডাইসির আইনের অনুশাসনের তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন (পরে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে)।

(১০) বিচারবিভাগের স্বাধীনতা

বিচারপতি অপসারণ

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে বিচারপতিরা কতটা স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে শাসনবিভাগের হস্তক্ষেপ ও প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারেন, তার ওপর। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে, বিপ্লবের আগে, বিচারপতিরা রাজার কর্মচারী বলে বিবেচিত হতেন। কিন্তু ১৭০০ সালের "অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট", ১৮৭৬ সালের "অ্যাপেলেট জুরিসডিকশন অ্যাক্ট" এবং সবশেষে ১৯৮১ সালের "সুপ্রিম কোর্ট অ্যাক্টের" মাধ্যমে ব্রিটেনের বিচারপতিদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে বিচারপতিদের অবসরের বয়স আইনের দ্বারা সুনির্দিষ্ট। নিম্ন আদালতের—যেমন, সার্কিট আদালতের—বিচারপতিদের এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের অযোগ্যতার কারণে বা অশোভন আচরণের জন্য কর্মচ্যুত করা গেলেও, উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের সম্মতি ছাড়া অপসারণ করা যায় না। বিচারপতিরা বেতন পান বিশেষ সঞ্চিত তহবিল (কনসলিডেটেড ফান্ড) থেকে। সরকার অথবা আইনসভা বিচারপতিদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

(১১) দুর্বল বিচারব্যবস্থা

অন্য অনেক দেশের তুলনায় বিচারবিভাগ দুর্বল

ব্রিটেনে লিখিত সংবিধান না-থাকায় এবং পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় ব্রিটেনের বিচারবিভাগ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতবর্ষের মতন দেশের বিচারবিভাগের তুলনায় দুর্বল। ব্রিটেনের আদালত পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন বা প্রথাগত আইন অনুসারে বিচার করে থাকে। বিচারপতিরা আইন ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু কোনো আইন বৈধ কিনা, তা দেখার বা বিচারবিভাগীয় পুনর্বিচারের ক্ষমতা তাঁদের নেই। তাঁরা পার্লামেন্ট প্রণীত কোনো আইনকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারেন না।

(১২) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অনুপস্থিতি

ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নেই

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বলতে বোঝায় আইন, শাসন ও বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তিদের পরিচালনাধীন করে তাদের কাজ ও ক্ষমতার ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র করা। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা মঁতেস্কিয় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের তিনটি অর্থ করেছিলেন—(ক) একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না; (খ) এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজ করবে না; এবং (গ) এক বিভাগ অপর কোনো বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে না। মঁতেস্কিয় ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু, তিনি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের যে অর্থ করেছেন, সেই অর্থে ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নেই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মতো নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির প্রয়োগও ব্রিটেনে দেখা যায় না। ব্রিটেনের রাজা বা রানি শাসন, আইন ও বিচার—এই তিন ধরনের ক্ষমতার প্রয়োগের সঙ্গেই জড়িত। গ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান সরকার রানির সরকার (Queen's Government)। মন্ত্রীরা রানির মন্ত্রী (Her Majesty's Ministers)। আইনসভা রানি এবং পার্লামেন্টকে নিয়ে গঠিত। আইনসভা-প্রণীত আইনে রানির সম্মতি দরকার হয়। বিচারবিভাগ বলতে বোঝায় রাজকীয় বিচারালয় (Royal Courts of Justice), যাতে বিচারকার্য নির্বাহ করে রানির নিযুক্ত বিচারপতিরা (Her Majesty's Judges)। ব্রিটেনের মন্ত্রীসভার সদস্যরা, যাঁরা শাসনবিভাগকে পরিচালনা করেন, তাঁরা আইনসভারও সদস্য। শুধু তাই নয়, মন্ত্রীরা আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য এবং সেজন্য আইনসভাকেও তাঁরা অনেকটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল লর্ড চ্যান্সেলর, যিনি বিচারব্যবস্থায় প্রধান বা সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি, তিনি একই সঙ্গে মন্ত্রীসভার সদস্য, বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী এবং আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ লর্ডসভার সভাপতি।

(১৩) নাগরিক অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতবর্ষের সংবিধানে নাগরিকদের অধিকার সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু ব্রিটেনে নাগরিক অধিকারের ভিত্তি সাধারণ আইন। যেহেতু ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত ও সুপরিবর্তনীয় এবং যেহেতু পার্লামেন্ট বা আইনসভা যে-কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং সাংবিধানিক আইনের কোনো বিশেষ ক্ষমতা নেই, সেজন্য যেসব অধিকার ব্রিটেনের নাগরিকরা ভোগ করে তা কোনো অর্থেই মৌলিক বা অপরিবর্তনীয় নয়। জনমতের প্রভাব, বিরোধীদলের সতত সজাগ দৃষ্টি এবং আদালতের নিয়ন্ত্রণ-প্রবণ ব্যাখ্যা—এগুলিই ব্রিটেনে নাগরিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছে বলে মনে করা হয়।

অধিকার সাংবিধানিক নয়

সাম্প্রতিককালে—বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর—'আইনের অনুশাসনের' ধারণাটি আন্তর্জাতিক তাৎপর্য লাভ করেছে। যার ফলে, এখন ন্যূনতম মানবিক অধিকারকে সুনির্দিষ্ট করে তা ঘোষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। মানবিক অধিকার সম্পর্কে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সমঝোতাও হয়েছে। একটি সনদ রচিত হয়েছে যেটি European Convention on Human Rights বলে পরিচিত। গ্রেট ব্রিটেন এই বোঝাপড়ার অংশীদার। ফলে, ব্রিটেনের একজন নাগরিক বর্তমানে তার অধিকার রক্ষার জন্য মানবাধিকার-সংক্রান্ত ইউরোপীয় আদালতেও উপস্থিত হতে পারে। মানবাধিকার-সংক্রান্ত ইউরোপীয় কমিশনের কাছে আবেদন জানানোর অধিকারও এখন স্বীকৃত। তবে, এর ফলে ব্রিটিশ সরকারের ওপরে যে বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়েছে, তা এখনও নৈতিক স্তরেই রয়ে গেছে, কেন না, মানবাধিকারের সনদ ব্রিটেনের সাংবিধানিক আইনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

মানবাধিকারের সনদ

৩.২. সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা কীভাবে চলে, তা বুঝতে হলে সাংবিধানিক রীতিনীতি সম্পর্কে জানা দরকার। ই. এ. ফ্রিম্যান (E. A. Freeman) ১৮৭২ সালে প্রকাশিত তাঁর Growth of the English Constitution বই-এ প্রথম আইনের সঙ্গে সাংবিধানিক রীতিনীতির পার্থক্য দেখিয়ে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তবে, ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় সাংবিধানিক রীতিনীতির গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরেন ডাইসি (Dicey) তাঁর Law of the Constitution বই-তে। ডাইসির বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা বা সংবিধান সম্পর্কে সব লেখাতে সাংবিধানিক রীতিনীতির পর্যালোচনা অপরিহার্য বিবেচিত হয়ে এসেছে।

(ক) সাংবিধানিক রীতিনীতি কাকে বলে?

সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি কতকগুলি অলিখিত নিয়মকানুন যেগুলি আইন নয় কিন্তু সাংবিধানিক আইনের মতো মান্য হয়। 'সাংবিধানিক রীতিনীতি' (Constitutional convention) নামকরণটি করেছিলেন ডাইসি। এইসব নিয়মকানুনের বর্ণনা দিয়ে ডাইসি লিখেছেন—"এগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অনেকের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করলেও বাস্তবে এগুলি আইন নয়, কারণ এগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য নয়"[১]।

ডাইসি-র সংজ্ঞা

(১৩) নাগরিক অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতবর্ষের সংবিধানে নাগরিকদের অধিকার সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু ব্রিটেনে নাগরিক অধিকারের ভিত্তি সাধারণ আইন। যেহেতু ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত ও সুপরিবর্তনীয় এবং যেহেতু পার্লামেন্ট বা আইনসভা যে-কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং সাংবিধানিক আইনের কোনো বিশেষ ক্ষমতা নেই, সেজন্য যেসব অধিকার ব্রিটেনের নাগরিকরা ভোগ করে তা কোনো অর্থেই মৌলিক বা অপরিবর্তনীয় নয়। জনমতের প্রভাব, বিরোধীদলের সতত সজাগ দৃষ্টি এবং আদালতের নিয়ন্ত্রণ-প্রবণ ব্যাখ্যা—এগুলিই ব্রিটেনে নাগরিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছে বলে মনে করা হয়।

অধিকার সাংবিধানিক নয়

সাম্প্রতিককালে—বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর—'আইনের অনুশাসনের' ধারণাটি আন্তর্জাতিক তাৎপর্য লাভ করেছে। যার ফলে, এখন ন্যূনতম মানবিক অধিকারকে সুনির্দিষ্ট করে তা ঘোষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। মানবিক অধিকার সম্পর্কে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সমঝোতাও হয়েছে। একটি সনদ রচিত হয়েছে যেটি European Convention on Human Rights বলে পরিচিত। গ্রেট ব্রিটেন এই বোঝাপড়ার অংশীদার। ফলে, ব্রিটেনের একজন নাগরিক বর্তমানে তার অধিকার রক্ষার জন্য মানবাধিকার-সংক্রান্ত ইউরোপীয় আদালতেও উপস্থিত হতে পারে। মানবাধিকার-সংক্রান্ত ইউরোপীয় কমিশনের কাছে আবেদন জানানোর অধিকারও এখন স্বীকৃত। তবে এর ফলে ব্রিটিশ সরকারের ওপরে যে বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়েছে, তা এখনও নৈতিক স্তরেই রয়ে গেছে, কেন না, মানবাধিকারের সনদ ব্রিটেনের সাংবিধানিক আইনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

মানবাধিকারের সনদ

৩.২. সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা কীভাবে চলে, তা বুঝতে হলে সাংবিধানিক রীতিনীতি সম্পর্কে জানা দরকার। ই. এ. ফ্রিম্যান (E. A. Freeman) ১৮৭২ সালে প্রকাশিত তাঁর Growth of the English Constitution বই-এ প্রথম আইনের সঙ্গে সাংবিধানিক রীতিনীতির পার্থক্য দেখিয়ে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তবে, ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় সাংবিধানিক রীতিনীতির গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরেন ডাইসি (Dicey) তাঁর Law of the Constitution বই-তে। ডাইসির বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা বা সংবিধান সম্পর্কে সব লেখাতে সাংবিধানিক রীতিনীতির পর্যালোচনা অপরিহার্য বিবেচিত হয়ে এসেছে।

(ক) সাংবিধানিক রীতিনীতি কাকে বলে?

সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি কতকগুলি অলিখিত নিয়মকানুন যেগুলি আইন নয় কিন্তু সাংবিধানিক আইনের মতো মান্য হয়। 'সাংবিধানিক রীতিনীতি' (Constitutional convention) নামকরণটি করেছিলেন ডাইসি। এইসব নিয়মকানুনের বর্ণনা দিয়ে ডাইসি লিখেছেন—"এগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অনেকের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করলেও বাস্তবে এগুলি আইন নয়, কারণ এগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য নয়"[১]।

ডাইসি-র সংজ্ঞা

পরবর্তীকালে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা সাংবিধানিক রীতিনীতির আরও স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন, জন ম্যাকিনটোশ (John Makintosh) অতীতে সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে অথবা প্রয়োগের নজির আছে এবং সাধারণভাবে সবাই মানে, এমন সব রাজনৈতিক রীতিনীতিকে সাংবিধানিক রীতিনীতি বা কনভেনশন বলে বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্যদের সংজ্ঞা

মার্শাল ও মুডি (Marshall and Moodie) সাংবিধানিক রীতিনীতির সংজ্ঞার্থ করে বলেছেন, সাংবিধানিক রীতিনীতি হল "সাংবিধানিক আচরণ সম্পর্কে সেইসব নিয়মকানুন যেগুলিকে সংবিধান যারা কার্যকর করে তারা তাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে মান্য বলে মনে করে, কিন্তু যেগুলি আদালতের দ্বারা অথবা পার্লামেন্টের দুই কক্ষের অধ্যক্ষদের দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়।"[২] এর মধ্যে ম্যাকিনটোশ-এর সংজ্ঞাটি বর্ণনামূলক, অর্থাৎ যা বাস্তবে দেখা যায় তারই বর্ণনা। কিন্তু মার্শাল ও মুডি যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি নির্দেশাত্মক, অর্থাৎ এতে অভিজ্ঞতা, এবং শুধু অভিজ্ঞতাই নয়, সাংবিধানিক নীতির ভিত্তি কী হওয়া উচিত তারও ইঙ্গিত রয়েছে। মার্শাল ও মুডি-র সংজ্ঞার অনুরূপ, কিন্তু আরও স্পষ্ট, একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন ও. হুড ফিলিপস (O. Hood Philips)। হুড ফিলিপস প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে সাংবিধানিক রীতিনীতি হল, "রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা আচরণের কতকগুলি নিয়মকানুন, যাদের ক্ষেত্রে এইসব নিয়মকানুন প্রযোজ্য তাদের কাছে এগুলিকে বাধ্যতামূলক বলে মনে করা হয়, কিন্তু এগুলি আইন নয়, কারণ আদালত বা পার্লামেন্ট এগুলিকে বলবৎ করে না।"[৩]

সাংবিধানিক রীতিনীতিকে অনেক সময় "অলিখিত আইন" অথবা প্রচলিত প্রথা (Custom) বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতি বলতে এর কোনোটিকেই বোঝায় না। সাংবিধানিক রীতিনীতি "অলিখিত আইন নয়", কারণ তা আইনই নয়। গ্রেট ব্রিটেনে "অলিখিত আইন" বলতে বোঝায় বিচারক-সৃষ্ট সাধারণ আইন বা কমন-ল-কে। বহুকাল ধরে মান্য হয়ে আসছে এমন প্রথাগত আইনও (Customary law) ব্রিটেনে আছে। তবে সাংবিধানিক রীতিনীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

অলিখিত ও প্রথাগত আইনের সঙ্গে পার্থক্য

(খ) বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি

ব্রিটিশ সংবিধান বিশেষজ্ঞরা সাংবিধানিক রীতিনীতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এইসব বৈশিষ্ট্য থেকে সাংবিধানিক রীতিনীতির প্রকৃতিকে জানা যায়। যেমন—

প্রথমত, অভ্যাস, ব্যবহার বা প্রথা ইত্যাদি এবং সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। মানুষ অভ্যাসমতো আচরণ করে কিংবা প্রথা মেনে চলে, কিন্তু এর কোনোটিই বাধ্যতামূলক নয়। অন্যদিকে, সাংবিধানিক রীতিনীতির বাধ্যবাধকতা জেনেই এগুলিকে মান্য করা হয়।

দ্বিতীয়ত, সাংবিধানিক রীতিনীতি রাজনৈতিক নিয়মকানুন বা বিধি (rules), অর্থাৎ এইসব রীতিনীতি শুধুমাত্র শাসনব্যবস্থার পরিচালনার সঙ্গেই সম্পর্কিত। অন্যান্য

অ-রাজনৈতিক নীতি-নিয়ম বা বিধির, যেমন নৈতিক বিধির সঙ্গে সাংবিধানিক রীতিনীতির কোনো সম্পর্ক নেই।

তৃতীয়ত, সাংবিধানিক রীতিনীতি অলিখিত নিয়মকানুন এবং বাধ্যতামূলক, কিন্তু এগুলি আইন হিসেবে স্বীকৃত নয়। সাংবিধানিক রীতিনীতি যে মানা হয় তার বিভিন্ন কারণ আছে। কোনো সাংবিধানিক রীতি ভঙ্গ করা হলে সাংবিধানিক ব্যবস্থায় সংকট দেখা দেয়, কিন্তু আদালতে গিয়ে তাকে বলবৎ করা যায় না।

চতুর্থত, ব্রিটেনে সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি গড়ে উঠেছে সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে। কোনো রীতিই রচিত হয়নি। সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোনো একসময়ে রাজনৈতিক প্রয়োজনে একটি রীতি প্রবর্তিত হয়েছে, এবং তারপর থেকে তা মানা হয়ে এসেছে। যেমন, রাজা বা রানি পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনে সম্মতি দিতে বাধ্য এই রীতিটি প্রবর্তিত হয়েছিল ১৭০৮ সালের পরে। ওই বছর রানি অ্যান শেষবারের মতো পার্লামেন্ট-রচিত আইনে সম্মতি দিতে অস্বীকার করেন। তারপরেই তাঁর এই অস্বীকার করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। একইভাবে লর্ডসভার সদস্য শেষ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯০২ সালে। তারপরেই এটি রীতি হিসেবে স্বীকৃত হয় যে, কেবল কমন্সসভার সদস্যই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন।

পঞ্চমত, ব্রিটেনে সাংবিধানিক রীতিনীতির দ্বারা প্রধানত সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের আভ্যন্তর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়; আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় তাদের রূপ। সরকারের এই অঙ্গগুলি হল রাজা বা রানি, মন্ত্রীসভা; আইনসভা, বিচারালয় প্রভৃতি। বেশিরভাগ রীতিনীতির উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বহুক্ষেত্রেই আইন রচনা করে পরিবর্তন আনার আনুষ্ঠানিকতা ও প্রচারকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সাংবিধানিক রীতিনীতির উদ্ভব হয়েছে। যেমন, ১৮ শতকের পর থেকে রাজার শাসনক্ষমতা লুপ্ত হয়েছে। পরপর আইন পরিবর্তন করে রাজার ক্ষমতা লোপ করা যেত। কিন্তু তা না করে, আইনগত বাহ্যিক রূপে রাজতন্ত্রকে অব্যাহত রেখেই সাংবিধানিক রীতিনীতির মাধ্যমে আভ্যন্তর সম্পর্কে পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে।

ষষ্ঠত, সাংবিধানিক রীতিনীতি অলিখিত নিয়মকানুন বলে অনেক সময় তাতে অস্পষ্টতা দেখা দেয়। তা ছাড়া সময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয় বলে অনেক সময় সাংবিধানিক রীতির বিষয়বস্তুতেও অনির্দিষ্টতা থাকে।

সপ্তমত, সাংবিধানিক রীতিনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হল, এর পরিবর্তনশীল চরিত্র। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় দেখা গেছে নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে এবং নতুন মূল্যবোধের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেক সময়েই নতুন রীতি গড়ে উঠেছে। যেমন প্রধানমন্ত্রী শুধু কমন্সসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে হবেন কিংবা প্রধানমন্ত্রী হতে হলে তাঁকে কমন্সসভার সদস্যপদ অর্জন করতে হবে—এই রীতিটির উদ্ভব হয়েছে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসারের সঙ্গে সংগতি রেখে। সাম্প্রতিককালে বোঝাপড়ার মাধ্যমেও কোনো কোনো সাংবিধানিক রীতি গড়ে উঠতে দেখা গেছে। যেমন কমনওয়েলথ-সংক্রান্ত রীতিনীতি।

(গ) সাংবিধানিক রীতিনীতির লক্ষ ও ভূমিকা

সাংবিধানিক রীতিনীতি শুধু অলিখিত সংবিধানেরই বৈশিষ্ট্য নয়। সংবিধান লিখিত এমন দেশেও সাংবিধানিক রীতিনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। যেমন—কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায় কিংবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়াতে ব্রিটেনে প্রচলিত এমন বহু

সাংবিধানিক রীতিকে মান্য করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেটের নিয়োগ-সংক্রান্ত নিয়মকানুন কিংবা সরকারি উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সিনেট সভার অনুমোদনের নিয়ম সাংবিধানিক রীতিনীতির উদাহরণ। এর প্রধান কারণ, সাংবিধানিক রীতিনীতির মাধ্যমে আইনের পরিবর্তন ছাড়াই সাংবিধানিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা যায়, এবং তার ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রেখে শাসনব্যবস্থার বিকাশ সম্ভব হয়। সাধারণভাবে সাংবিধানিক রীতিনীতির একটি উদ্দেশ্যই হল, সাংবিধানিক আইন পরিবর্তন না করে সময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ—(১) আইন পরিবর্তন না করে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধন

দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনের সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ রীতিনীতিরই মূল লক্ষ নির্বাচকদের বৃহত্তর অংশের ইচ্ছানুযায়ী যাতে সরকারি কাজকর্ম পরিচালিত হয়, সেটা সুনিশ্চিত করা। মন্ত্রীসভার গঠন ও দায়িত্বশীলতা-সংক্রান্ত রীতিনীতিগুলি এই উদ্দেশ্যপূরণের জন্যই গড়ে উঠেছে। যেমন, একটি রীতি হল, কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হবে। কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মানেই নির্বাচকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি। কাজেই এই রীতিটির উদ্দেশ্য নির্বাচকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে মন্ত্রী নির্বাচন, যাতে মন্ত্রীসভা ওই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অথবা সম্ভবত সমগ্র জাতির মতামত ও ইচ্ছাকে সরকারের মাধ্যমে রূপায়িত করতে পারে। রানি মন্ত্রীসভার পরামর্শ মেনে চলবেন, কমন্সসভার আস্থা হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হবে, কিংবা লর্ডসসভার ওপরে কমন্সসভার প্রাধান্য থাকবে, বিশেষ করে অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে—এ-জাতীয় সব সাংবিধানিক রীতিনীতিরই উদ্দেশ্য শাসনব্যবস্থাকে যতটা সম্ভব গণতান্ত্রিক চরিত্র দেওয়া।

(২) শাসন-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক চরিত্র দেওয়া

তৃতীয়ত, ব্রিটেনের সাংবিধানিক রীতিনীতির আর-একটি লক্ষ, রাজা বা রানির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা। সাংবিধানিক রীতিনীতির মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়েছে। যার ফলে, ১৬৮৮ সালেও যে রাজতন্ত্র ছিল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী বর্তমানে তা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র। ব্রিটেনের পুরুষানুক্রমে রাজা বা রানি আছেন রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিন্তু গণতান্ত্রিক। এই ব্যবস্থায় শাসনবিভাগের প্রধান বা প্রধান শাসক প্রধানমন্ত্রী, নামে রাষ্ট্রপ্রধান রাজা বা রানি। প্রধানমন্ত্রীর পদটির কোনো আইনগত ভিত্তি নেই, এটি সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার ক্ষমতাও নির্দিষ্ট হয়েছে সাংবিধানিক রীতিনীতির দ্বারা।

(৩) রাজা বা রানির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা

চতুর্থত, ব্রিটেনে সাংবিধানিক রীতিনীতির অন্য আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তা হল—সাংবিধানিক রীতিনীতির মাধ্যমেই সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে ওঠে এবং সরকারের কাজকর্মের মধ্যে সংহতি দেখা যায়। যেমন, ব্রিটেনের ক্যাবিনেট ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা ও তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন সম্ভব হয়েছে। শুধু বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমন্বয়সাধনই নয়, ক্যাবিনেট ব্যবস্থা পার্লামেন্টের সঙ্গে সরকারের বিভাগগুলির এবং মন্ত্রীসভার সঙ্গে রাজা বা রানির যোগাযোগ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। একইভাবে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মধ্যে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তুলতেও সাংবিধানিক রীতিনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৪) সরকারের কাজে সংহতি-সাধন

নীতির
বিভাগ

(ঘ) ব্রিটেনের সাংবিধানিক রীতিনীতির বিভিন্ন শ্রেণি

ব্রিটেনের সাংবিধানিক রীতিনীতির পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেওয়া অসম্ভব। এমনকি, বিভাগ রীতিনীতির সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অর্থ নিরূপণ করাও কঠিন। সেজন্য ব্রিটেনের সংবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন লেখায় সংবিধান বিশেষজ্ঞরা প্রচলিত রীতিনীতিগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন, ও. হুড ফিলিপস (O. Hood Phillips) তিন শ্রেণির রীতিনীতির কথা বলেছেন—(১) রাজা বা রানির বিশেষাধিকার প্রয়োগ-সংক্রান্ত এবং ক্যাবিনেট ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত রীতিনীতি; (২) লর্ডস ও কমন্সসভার মধ্যে সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ এবং পার্লামেন্টের কার্যপ্রণালী-সংক্রান্ত রীতিনীতি ; এবং (৩) ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের সঙ্গে কমনওয়েলথের সদস্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্কের নিয়ন্ত্রক রীতিনীতি। **হার্ভে ও ব্যাথার** (J. Harvey and L. Bather) রীতিনীতিগুলিকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন—(১) রাজা বা রানির বিশেষ ক্ষমতা-সংক্রান্ত রীতিনীতি ; (২) ক্যাবিনেট ব্যবস্থার পরিচালনা-সংক্রান্ত রীতিনীতি ; (৩) আইনসভা বা দুটি কক্ষের কার্যপ্রণালী-সংক্রান্ত রীতিনীতি ; এবং (৪) কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক-সংক্রান্ত রীতিনীতি। লক্ষণীয় যে, এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে রীতিনীতিগুলি কাদের নিয়ন্ত্রণ করছে এবং কী নিয়ন্ত্রণ করছে, তার ভিত্তিতে।

নীচে হার্ভে ও ব্যাথারকে অনুসরণ করে সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলিকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করে প্রতিটি শ্রেণির অন্তর্গত প্রধান প্রধান রীতিগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে :

১। রাজা বা রানির বিশেষ ক্ষমতা-সংক্রান্ত রীতিনীতি :

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানির, বর্তমানে রানির, কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা আছে, যেমন—রানি যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন কিংবা শান্তি স্থাপন করতে পারেন; যে কোনো সময়ে পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারেন এবং তিন বছর পর্যন্ত নতুন পার্লামেন্ট গঠন না করতে বা পার্লামেন্টের অধিবেশন না ডাকতে পারেন; পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ থেকে পাস হয়ে এলেও কোনো আইনের প্রস্তাবে সম্মতি না দিতে পারেন; যে কোনো সময়ে মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন, ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর এইসব ক্ষমতার কোনোটিই চূড়ান্ত বা চরম নয়। বিভিন্ন সাংবিধানিক রীতিনীতির দ্বারা রাজকীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

এই ধরনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক রীতি হল—(ক) রাজা বা রানি কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রীপরিষদ গঠনের জন্য আহ্বান করবেন। এবং মন্ত্রীপরিষদের একটি ছোটো অংশকে নিয়ে গঠিত হবে মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেট।

(খ) রানি মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের নিয়োগ করবেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে।

(গ) রাজা বা রানির যে আইনগত ক্ষমতা আছে তার ব্যবহার করতে তিনি প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে আসা মন্ত্রীসভার পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

(ঘ) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ থেকে (অথবা পার্লামেন্ট অ্যাক্ট অনুসারে কমন্সসভা থেকে) কোনো আইনের প্রস্তাব পাস হলে রাজা বা রানি তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকবেন।

(ঙ) বছরে অন্তত একবার রাজা বা রানিকে পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে।

২। ক্যাবিনেট ব্যবস্থার পরিচালনা-সংক্রান্ত রীতিনীতি

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা মন্ত্রীসভা-চালিত। মন্ত্রীপরিষদের একটি ক্ষুদ্র অংশকে (inner ring) বলে মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেট। মন্ত্রীসভার শীর্ষে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ এবং মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেট-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা পুরোটাই সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অল্প কিছুদিন আগেও ব্রিটেনের কোনো আইনেই প্রধানমন্ত্রীর পদের কোনো উল্লেখ ছিল না। এখনও যেটুকু দেখা যায় তা বেতন, অবসরকালীন ভাতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে। ১৯৬৭ সালের 'পার্লামেন্টারি কমিশনার অ্যাক্ট' কিংবা ১৯৮৪ সালের ডাটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট-এ ক্যাবিনেটের উল্লেখ আছে, তাও মন্ত্রীদের বেতন প্রসঙ্গেই। যেসব সাংবিধানিক রীতিনীতির দ্বারা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেটের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এরকম—

(ক) কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর নেতা প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং তাঁর পরামর্শমতো মন্ত্রীপরিষদের অন্যান্য সদস্য রাজা বা রানি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

(খ) প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই কমন্সসভার সদস্য হতে হবে ; অন্যান্য মন্ত্রীদেরও কমন্সসভা অথবা লর্ডসসভার সদস্য হতে হবে। কেউ মন্ত্রী হবার সময় পার্লামেন্টের সদস্য না থাকলে তাঁকে অনতিবিলম্বে সদস্যপদ অর্জন করতে হবে, নাহলে তিনি মন্ত্রী থাকতে পারবেন না।[৪]

(গ) মন্ত্রীপরিষদকে (ব্রিটেনে মন্ত্রীপরিষদই সরকার) ক্ষমতায় থাকতে হলে কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আস্থাভাজন থাকতে হবে। কমন্সসভায় সরকারের সমর্থনে আস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটিতে সরকার পক্ষ পরাজিত হয়ে প্রস্তাবটি পাস হলে অথবা সরকারের বিপক্ষে আনীত অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব পাস হলে প্রধানমন্ত্রী হয় পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার জন্য রানিকে পরামর্শ দেবেন, নতুবা পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকবেন।

(ঘ) মন্ত্রীরা তাঁদের কাজকর্মের জন্য যৌথভাবে পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল থাকবেন। যার অর্থ, সব বিষয়ে—অন্ততপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে—মন্ত্রীদের মধ্যে ঐকমত্য থাকতে হবে, এবং কোনো মন্ত্রী যদি মন্ত্রীসভার কোনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে না-পারেন, তাহলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে, কিংবা মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে চুপ করে থাকতে হবে।

(ঙ) প্রতিটি মন্ত্রী এককভাবেও তাঁর দপ্তরের কাজকর্মের ব্যাপারে পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল থাকবেন। এর অর্থ দুটি। প্রথমত, তাঁর দপ্তর সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন পার্লামেন্টে উত্থাপিত হলে, তার উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাস হলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকবেন।

(চ) কমন্সসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন ছাড়া মন্ত্রীসভা রাজা বা রানিকে যুদ্ধ ঘোষণা করার অথবা কোনো চুক্তি সম্পাদন করার পরামর্শ দিতে পারবে না।

৩। আইনসভা বা পার্লামেন্টের দুই কক্ষের কার্যপ্রণালী-সংক্রান্ত রীতিনীতি

ব্রিটেনের পার্লামেন্ট (আইনসভা বা সংসদ) দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত—একটি কমন্সসভা, অপরটি লর্ডসসভা। এর মধ্যে কমন্সসভা গঠিত হয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে।

অন্যদিকে, লর্ডসসভার সদস্যদের একটি অংশ বংশানুক্রমে লর্ড উপাধিধারী, অন্য অংশ মনোনীত সদস্য। উভয় কক্ষের কার্যপ্রণালী এবং পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকটাই নির্ধারিত হয় সাংবিধানিক রীতিনীতির দ্বারা। এই ধরনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক রীতিনীতি হল—

(ক) কোনো বিষয়ে দু কক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য বা সংঘাত দেখা দিলে লর্ডসসভাকে শেষ পর্যন্ত কমন্সসভার মতকেই মেনে চলতে হয়।

(খ) সরকারি অর্থব্যয়-সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাব কেবলমাত্র কমন্সসভাতেই রাজা বা রানির হয়ে কোনো মন্ত্রীর দ্বারা উত্থাপিত হতে পারে।

(গ) কমন্সসভার কার্যসূচি নির্ধারণ স্পিকার করেন না। প্রধানমন্ত্রী অথবা কক্ষের নেতা ওই কার্যসূচি স্থির করেন বিরোধীদলের নেতার সঙ্গে আলোচনা করে।

(ঘ) পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যালঘু দলকে দমন করতে পারবে না। বিতর্কের সময় সংখ্যালঘু দলের সদস্যরা যাতে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে, সেটা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব স্পিকারের।

(ঙ) পার্লামেন্টের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্যসংখ্যার অনুপাতে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি রাখতে হবে।

(চ) লর্ডসসভার সদস্য যেসব লর্ডদের উচ্চ বিচারকপদে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা লর্ডসসভা সর্বোচ্চ বিচারালয় হিসেবে কাজ করার সময় তাতে অংশ নিতে পারবেন না।

৪। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক-সংক্রান্ত রীতিনীতি ঃ

কমনওয়েলথে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়েও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রীতিনীতি সাম্প্রতিককালে গড়ে উঠেছে। এগুলি প্রধানত কমনওয়েলথের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ রক্ষার পদ্ধতি এবং অন্যান্য বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্ধারণ-সংক্রান্ত। এইসব রীতিনীতির বেশ কয়েকটি দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সম্মেলনে (Imperial Conferences) রচনা করা হয়েছিল। তবে, তা সত্ত্বেও, এগুলি রীতিনীতি হিসেবেই স্বীকৃত, আইনের মর্যাদা পায়নি।

নীচে এই ধরনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রীতিনীতির উল্লেখ করা হল—

(ক) বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ না হলে এবং সেই দেশের সম্মতি না পেলে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট কোনো প্রাক্তন উপনিবেশ সম্পর্কে আইন রচনা করতে পারবে না।

(খ) ব্রিটেনের রাজা (বা রানির) পদে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো পরিবর্তন করতে হলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ছাড়াও কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের পার্লামেন্টের সম্মতির প্রয়োজন হবে।

(গ) ব্রিটেনের রানি যখন কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার মতন কোনো কমনওয়েলথভুক্ত দেশের গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করবেন, তখন তাঁকে সেই দেশের সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।

(ঘ) কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির গভর্নর জেনারেলরা রানির প্রতিনিধি, ব্রিটিশ সরকারের নয়। তাঁরা সর্বদা ওই দেশের সরকারের পরামর্শমতো চলবেন।

(ঙ) বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণ ও বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি পরস্পরকে অবহিত রাখবে এবং

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেউই অপরকে কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণে বাধ্য করতে পারবে না।

(৬) সাংবিধানিক রীতিনীতি মান্য হওয়ার কারণ (কেন সাংবিধানিক রীতিনীতিকে মানা হয়?)

সাংবিধানিক রীতিনীতি আইন নয়। কাজেই রীতিনীতি ভঙ্গ করলে শাস্তির বিধান নেই। আদালতেও যাওয়া যায় না। তাহলে, রীতিনীতি মানা হয় কেন? রীতিনীতির পেছনে এমন কী ক্ষমতা (Sanction) আছে যার জন্য রীতিনীতি ভঙ্গ করা যায় না? ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজেছেন। একটি বিষয়ে এঁদের মধ্যে ঐকমত্য দেখা যায়, তা হল, রীতিনীতি যে মান্য করা হয় তার কারণ এই নয় যে, সেগুলি ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হবে, মান্যতার অন্য কারণ আছে। তবে কী সে কারণ, সে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সবাই একমত নন।

ডাইসি তাঁর An Introduction to the Law of the Constitution বই-এ সাংবিধানিক রীতিনীতি মান্য করার কারণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ব্রিটেনের সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে সংবিধানের মূলনীতিগুলি প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্য, কোনো একটি নীতি বা কোনো বিশেষ রীতি ভঙ্গ করলে শেষ পর্যন্ত কোনো-না-কোনো আইনভঙ্গের অপরাধে জড়িয়ে পড়তে হয়। অর্থাৎ, রীতিনীতির মান্যতার পেছনেও থাকে আইনের শক্তি বা ক্ষমতা। রীতিনীতি অমান্য করলে শেষ পর্যন্ত আইন অমান্য করতে হয় এবং তার জন্য শাস্তি পেতে হয়।[৫] ডাইসি উদাহরণ দিয়ে তাঁর এই ব্যাখ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যেমন, ব্রিটেনে একটি রীতি আছে বছরে অন্তত একবার সংসদের অধিবেশন বসতে হবে। যদি কখনও এক বছরের বেশি সময় সংসদের অধিবেশন না ডাকা হয়, তাহলে তার ফলে অর্থ আইন (Finance Act) পাস করা যাবে না, অর্থাৎ আইনানুসারে কর আদায় সম্ভব হবে না, সামরিক বাহিনী-সংক্রান্ত আইন (The Army Act) বাতিল হয়ে যাবে এবং সৈন্যবাহিনীর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, সরকার সংসদের সম্মতি না পাওয়ার ফলে সৈন্যবাহিনী কিংবা প্রশাসনের জন্য কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারবে না, ইত্যাদি। এরকম পরিস্থিতিতে রাজাকে হয় সংসদের অধিবেশন ডাকতে হবে নয়তো বেআইনিভাবে অর্থ আদায় করতে হবে—অর্থাৎ, দেশের আইন ও আদালতের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হবে। একইভাবে কমন্সসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হবার পরেও যদি মন্ত্রীসভা পদত্যাগ না করে, তাহলে কমন্সসভা থেকে কোনো অর্থ মঞ্জুরির প্রস্তাব অনুমোদন করানো যাবে না, তার ফলে সরকারের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে।

ডাইসি যেভাবে রীতিনীতির মান্যতার কারণ আলোচনা করেছেন, তা সব রীতিনীতি কেন মানা হয় তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। **প্রথমত**, ডাইসি যেসব উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলি বিশেষ এক ধরনের রীতিনীতির। এইসব রীতিনীতি শাসনবিভাগের সঙ্গে সংসদের, আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, সরকারের সঙ্গে কমন্সসভার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে।

এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এমন বহু রীতিনীতি আছে যা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেগুলি ভঙ্গ করলে সঙ্গে সঙ্গে আইনভঙ্গ করা হয় না, কিংবা সরকারের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় না। যেমন, একটি রীতি আছে, কোনো সাংসদ স্পিকার নির্বাচিত হলে তিনি দল থেকে পদত্যাগ করবেন। এ-ধরনের আরও বহু রীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। সেগুলি কেন মানা হয় ডাইসি-র ব্যাখ্যা তার সদুত্তর দিতে পারে না। **দ্বিতীয়ত,** ডাইসি যেসব রীতিনীতির উল্লেখ করেছেন সেগুলি কেন মানা হয়, তার কারণ সম্পর্কেও তাঁর ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়। সরকার যদি কমন্সসভার আস্থাভাজন থাকে, তাহলে রীতিনীতি ভঙ্গ করলেও কোনো অসুবিধে হয় না। কারণ, প্রয়োজনমতো সরকার কমন্সসভাকে দিয়ে আইন পরিবর্তিত করে নিতে পারে। ১৯১৩ সালে 'বাওলস বনাম ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' (Bowles v. The Bank of England) মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কর আদায়-সংক্রান্ত আইন এইভাবেই পরিবর্তিত হয়েছিল। এরকম উদাহরণ আরও আছে। তা ছাড়া, যদি সরকারের প্রতি কমন্স সভা অনাস্থা জ্ঞাপন করেও, তাহলে ডাইসি যেভাবে ভেবেছেন, সরকারকে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। বস্তুত, অর্থ আইন (Finance Act) কিংবা সামরিক বাহিনী-সংক্রান্ত আইনের মেয়াদ না ফুরোনো পর্যন্ত সরকার পদত্যাগ না করেই চালিয়ে যেতে পারে। **তৃতীয়ত,** ডাইসির ব্যাখ্যার আর-একটি দুর্বলতা হল, আইন কেন মানা হয় সে-সম্পর্কে তাঁর ধারণা। ডাইসি ছিলেন আইনজ্ঞ এবং এমন সময়ে যখন অস্টিনের আইনের তত্ত্ব প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেজন্য তিনি ধরেই নিয়েছেন আইনের মান্যতার একমাত্র কারণ আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয়। এই ধারণার সাহায্যে তিনি রীতি-নীতির মান্যতার কারণ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু আইন যে মানা হয় তা শুধু শাস্তির ভয়েই নয়, আইনের মান্যতার পেছনে অন্য কারণও থাকে। কাজেই শুধু 'শাস্তির ভয়' দিয়ে আইন বা রীতিনীতির কোনোটারই মান্যতার ব্যাখ্যা করা যায় না।

কাজেই, না-মানলে নিছক আইন ভঙ্গ করা হয় বলেই সাংবিধানিক রীতিনীতি মেনে চলা হয় একথা ঠিক নয়। সাংবিধানিক রীতিনীতির মান্যতার পেছনে অন্যান্য কারণ আছে। যেমন—

লাওয়েল-এর মত— অলিখিত বোঝাপড়া

(১) লাওয়েল-এর (Lowell) মতে, রীতিনীতি মানা হয় তার কারণ এই নয় যে, অমান্য করলে আইন ভঙ্গ করা হবে। ব্রিটেনে রীতিনীতিকে মান্য করা হয় তার কারণ, ব্রিটেনে একটিমাত্র শ্রেণি দীর্ঘকাল ধরে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে এবং এই শাসকশ্রেণি নিজ শ্রেণি শাসনের স্বার্থেই যে অলিখিত বোঝাপড়ার ভিত্তিতে তাদের হাতে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে, তা ভঙ্গ করতে চায় না। সেজন্য, লাওয়েল-এর ভাষায়, রীতিনীতি মান্য করাকে তারা 'code of honour' হিসেবে দেখে। অর্থাৎ, এর সঙ্গে তাদের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। এ অনেকটা ক্রীড়াজগতের নিয়মকানুনের (rules of game) মতো। এগুলি মানবার জন্য বাইরের চাপ প্রয়োজন হয় না, শাসকশ্রেণি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এগুলিকে মেনে চলে।

জেনিংস-এর মত— (১) জনমতের শক্তি

(২) জেনিংস (Ivor Jenings) মনে করেন যে, রীতিনীতি মান্য হওয়ার মূল কারণ, এগুলির পেছনে জনমতের সমর্থন আছে। জেনিংস আইন এবং রীতিনীতি উভয়েরই মান্যতার মূল কারণ হিসেবে শক্তি নয় জনমতকেই চিহ্নিত করেছেন। প্রায় একই মত প্রকাশ করেছেন অগ এবং জিংক (Ogg and Zink)। এঁরা মন্তব্য করেছেন, রীতিনীতি কেন মানা হয় তার চূড়ান্ত কারণ খুঁজতে হলে মূলত জনমতের ক্ষমতাকে লক্ষ করতে হবে।

(৩) জেনিংস রীতিনীতি মানার আর-একটি কারণের কথাও বলেছেন। তা হল, ব্রিটেনের সাংবিধানিক রীতিনীতি অধিকাংশই মূলত সরকারের বিভিন্ন পদাধিকারীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ

(২) রাজনৈতিক সমস্যার সম্ভাবনা

করে। সেজন্য এগুলি ভঙ্গ করলে তা রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করে। তবে সব রীতিনীতির ক্ষেত্রেই মান্যতার এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়।

কানাডার সুপ্রিম কোর্টের অভিমত

(৪) ১৯৮২ সালে একটি মামলার রায়ে কানাডার সুপ্রিম কোর্ট রীতিনীতি মানার একটি প্রধান কারণের উল্লেখ করেছিল। ওই কোর্টের মতে, রীতিনীতির মূল উদ্দেশ্যই হল, সংবিধানের আইনগত কাঠামোটির সঙ্গে সমসাময়িক সাংবিধানিক মূল্যবোধের সংগতি রক্ষা করা। সেজন্য রীতিনীতি মান্য করার ইতিবাচক কারণ, রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে প্রধান সাংবিধানিক মূল্যবোধগুলি প্রকাশিত হয় এবং রীতিনীতি ভঙ্গ করলে বাস্তবে সেই মূল্যবোধগুলিকেই বর্জন করা হয়। অন্যদিকে নেতিবাচক দিক থেকে রীতিনীতিকে মান্য করা হয়, তার কারণ, না মানলে অসাংবিধানিক আচরণের সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

আইনে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা

(৫) অনেকের মতে, রীতিনীতিকে মেনে চলার একটি প্রধান কারণ হল, এই আশঙ্কা যে কোনো একটি রীতিকে ভঙ্গ করলেই তা আইনে পরিণত হবে। যেমন, ১৯০৯ সালে লর্ডসসভা কমন্সসভা কর্তৃক অনুমোদিত রাজস্ব বিল প্রত্যাখ্যান করার প্রতিক্রিয়াতে ১৯১১ সালে আইন প্রণয়ন করে লর্ডসসভার হাত থেকে অর্থ বিল প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। বর্তমানে কোনো অর্থবিল কমন্সসভা থেকে অনুমোদিত হওয়ার পর একমাসের মধ্যে লর্ডসসভা তা অনুমোদন না করলে, লর্ডসসভার অনুমোদন ছাড়াই সেটি আইনে পরিণত হয় এবং রাজা বা রানির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। একই কারণে রাজা বা রানি সংসদ থেকে অনুমোদিত আইনের প্রস্তাবে সম্মতিদানের রীতি মেনে চলেন। কারণ, রাজা বা রানি অসম্মতি জানালে আইন করে সম্মতিদান বাধ্যতামূলক করা হবে, এমনকি রাজতন্ত্র বিলুপ্তও করা হতে পারে।

ল্যাস্কির অভিমত—লক্ষ ও উদ্দেশ্যকে জনসাধারণ সমর্থন করে

(৬) ল্যাস্কির মতে, ব্রিটেনে সাংবিধানিক রীতিনীতি মান্য করা হয়, তার কারণ, জনসাধারণ এগুলিকে বাধ্যতামূলক ও পবিত্র ("binding and sacred") বলে মনে করে। বাধ্যতামূলক ও পবিত্র এইজন্য যে, রীতিনীতিগুলির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে জনসাধারণ সমর্থন করে। অর্থাৎ, ল্যাস্কি রীতিনীতির মান্যতার কারণ হিসেবে রীতিনীতি যে উদ্দেশ্যসাধন করে তাকে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এডমন্ড বার্কের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রীতিনীতির দুটি উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। **প্রথমত,** রীতিনীতি আইনের প্রয়োগ কীভাবে হবে তা নির্ধারণ করে এবং সংবিধানকে চালু রাখে ; **দ্বিতীয়ত,** সংবিধান যাতে সমসাময়িক প্রচলিত সাংবিধানিক তত্ত্বের সঙ্গে সংগতি রেখে কাজ করতে পারে, তা সুনিশ্চিত করে।

হার্ভে ও ব্যাথারের মত—রীতিনীতির বিশেষ ভূমিকা

(৭) হার্ভে এবং ব্যাথারের (Harvey and Bather) মতে, রীতিনীতি আইনের মত আদালতে গ্রাহ্য নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, রীতিনীতি আইনের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ বা কম বাধ্যতামূলক। বস্তুত আইন যেমন মানতে হয় রীতিনীতিও তেমনি মানতে হয়। তার কারণ, সাংবিধানিক ব্যবস্থায় রীতিনীতির একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। যেমন,—**প্রথমত,** রীতিনীতি সরকারি যন্ত্রকে ঠিকমতো চলতে সাহায্য করে। **দ্বিতীয়ত,** রীতিনীতি সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলির নমনীয়তা (flexibility) রক্ষা করে। এবং **তৃতীয়ত,** রীতিনীতি সংবিধানকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করে। রীতিনীতি যে মেনে চলা হয় তার একটি কারণ, ডাইসি যে কথা বলেছেন, কোনো কোনো রীতি না-মানলে আইন ভঙ্গ করা হয় ; কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। রীতিনীতি মানার প্রধান কারণ, জনমতের চাপ ; কেন না, জনমত সব সময়েই চায় রাজনীতিবিদরা সংবিধানের মূল নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে আচরণ করুক। কাজেই, রীতিনীতির মান্যতার মূলে আছে নৈতিক নির্দেশ, আইনের বাধ্যতা নয়।

(৮) কোনো কোনো লেখক রীতিনীতি মানার কারণ হিসেবে ব্রিটেনের জনসাধারণের জাতিগত চরিত্র ও তাদের জীবন-দর্শনকে চিহ্নিত করেছেন। ব্রিটেনের জনসাধারণের জাতিগত চরিত্র ও জীবন-দর্শনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল, রক্ষণশীলতা এবং ঐতিহ্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা। সাংবিধানিক রীতিনীতিকে তারা ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার ঐতিহ্যের বাহক হিসেবেই দেখে। কেন না, **প্রথমত,** এগুলি সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত আছে ; **দ্বিতীয়ত,** গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে এগুলি জড়িত ; এবং **তৃতীয়ত,** এগুলি ব্রিটেনের রাজনৈতিক জীবনধারার অঙ্গ। সেজন্য রীতিনীতি ভঙ্গ করার কথা তারা ভাবতে পারে না। বস্তুত, আইন ও রীতিনীতির মধ্যে তারা কোনো আনুষ্ঠানিক পার্থক্যও করে না। জনসাধারণ মনে করে আইন যেমন মানতে হয়, রীতিনীতিও তেমনি বাধ্যতামূলকভাবে মান্য।

জনসাধারণের মানসিকতা

উপসংহার

স্যার আইভর জেনিংস তাঁর Cabinet Government বই-এ রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, রীতিনীতিগুলি নিছক রীতিনীতি বলেই যে রয়ে গেছে তা নয়, রীতিনীতিগুলি আছে তার কারণ সেগুলি থাকার যুক্তিসংগত কারণ আছে।[৬] এই 'কারণ' রীতিনীতিগুলির উপযোগিতা। যেমন, রীতিনীতি ব্রিটেনের সংবিধানের চারটি মূল নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করে। মূল নীতিগুলি হল—শাসনব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক, সংসদীয়, সীমাবদ্ধ রাজতান্ত্রিক এবং মন্ত্রীসভা-চালিত। রীতিনীতির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার কাঠামোটি সচল থাকে। ইংরেজ জাতির মানসিকতা ও অভ্যাসে এগুলি এমন গভীরভাবে প্রোথিত এবং এগুলিকে ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা শাসনযন্ত্র এত সুদৃঢ় যে, তারা কখনোই রীতিনীতি ভঙ্গ করার কথা ভাবতে পারে না।

চিনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা

৪ মে-র আন্দোলন চিনের বুদ্ধিজীবী সমাজকে বিপুলভাবে আলোড়িত করেছিল। পশ্চিমি দেশগুলি সম্পর্কে মোহমুক্তি সর্বাত্মক হওয়ার এটি একটি কারণ। অন্যদিকে, বিপ্লবের পর রাশিয়ার বলশেভিক সরকার রাশিয়ার জার (সম্রাট) একদা চিনে যেসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছিল সেইসব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। যার ফলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে অনুকূল মানসিকতার সঞ্চার হয়েছিল। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের লেখাপত্র চিনে আসা শুরু করেছিল রুশ বিপ্লবের সময় থেকেই। ১৯১৮ সালে বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক **লি দাঝাও** ও **চেন তুসিউ**-এর উদ্যোগে একটি মার্কসবাদী পাঠচক্র গড়ে উঠেছিল। যুবক **মাও জে দঙ্** এই পাঠচক্রের ছাত্র ছিলেন। পরে এই ধরনের আরও কয়েকটি পাঠচক্র বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪ মে-র আন্দোলনের পর মার্কসবাদের প্রতি এই আকর্ষণ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালের মধ্যেই লি এবং চেন মার্কসবাদের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। বেইজিং ছাড়াও সাংহাই, হ্যাঙ্কাও, চাঙ্গসা, সিনান প্রভৃতি জায়গায় মার্কসবাদী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ওই বছরই, অর্থাৎ ১৯২০ সালে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধি **ভয়তিনস্কি** (Voitinsky) চিনে এসে লি, চেন ও অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

চিনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালের ১ জুলাই সাংহাই-এ পার্টির প্রথম সম্মেলনে ৫০ জন সদস্যের ১২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। চেন যদিও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না, তবুও তাঁকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়।

১৯১৯ সাল থেকেই চিনে শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে ১৭০টির বেশি শ্রমিক ধর্মঘট হয়। এতে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক অংশ নিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পর শ্রমিক আন্দোলনে নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠতে থাকে। পার্টি একটি **ট্রেড ইউনিয়ন** সম্পাদকমণ্ডলী (Secretariat) গঠন করে এবং শ্রমিক সংঘ সংগঠিত করে। পার্টির পক্ষ থেকে Labour Weekly নামে একটি সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। ১৯২২-২৩ সালের মধ্যে সমগ্র দেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১০০-র বেশি ধর্মঘট হয়। প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক এতে অংশ নিয়েছিল।

শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে পার্টির নেতৃত্ব

শুধু শ্রমিক সংগঠনই নয়, এই সময় পার্টির নেতৃত্বে কৃষক সংগঠনও গঠিত হয়। আঞ্চলিক সামরিক শাসনকর্তাদের (warlords) অত্যাচারে জর্জরিত উত্তর চিনের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকরা ১৯২২ সালে আন্দোলনে ফেটে পড়েছিল। কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে থাকে। ওই বছরই দক্ষিণ চিনে কমিউনিস্ট **পেং পাই** (Peng Pai)-এর নেতৃত্বে ২ লক্ষ কৃষককে নিয়ে **প্রথম কৃষক সংঘ** (Peasant Union) গঠিত হয়েছিল।

১৯২১ সালে প্রথম সম্মেলনে (Congress) কমিউনিস্ট পার্টি যে কর্মসূচি (Programme) গ্রহণ করে তাতে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করে ধনতন্ত্রকে এড়িয়ে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং গণতান্ত্রিক-বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে সবরকমের সমঝোতার সম্ভাবনা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। এই কর্মসূচিতে অতি-বামপন্থার ঝোঁক ছিল স্পষ্ট। লেনিন ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় সম্মেলনে উত্থাপিত দলিলে ঔপনিবেশিক ও পশ্চাৎপদ দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের প্রসঙ্গে ওইসব দেশের বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার যে প্রস্তাব করেছিলেন, স্পষ্টতই তা কোনো গুরুত্ব পায়নি।

কর্মসূচি

পরের বছর, ১৯২২ সালের জুলাই মাসে, চিনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলনে মূলত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রণোদনায় কর্মসূচি সংশোধন করে সান-ইয়াৎ-সেন-এর নেতৃত্বে পরিচালিত গুয়োমিন্টাং দলের সঙ্গে দ্বিদলীয় মোর্চা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। গুয়োমিন্টাং দলের পিছনে জনসমর্থন ছিল অনেক ব্যাপক। তাছাড়া, সান-ইয়াৎ-সেন ছিলেন অনমনীয় বিপ্লবী মানসিকতা-সম্পন্ন নেতা। সান দুই দলের মোর্চা গঠনে রাজি না-হলেও তাঁর দলে কমিউনিস্টদের ব্যক্তিগতভাবে যোগ দেওয়ার প্রস্তাবে রাজি হন। ঠিক হয় কমিউনিস্টরা গুয়োমিন্টাং দলের মধ্যে থেকে কাজ করবে, যদিও কমিউনিস্ট পার্টির আলাদা সংগঠন থাকবে। একে **"ব্লক উইদিন"** (Block Within) বলা হয়।

ব্লক উইদিন

১৯২৩ সালে আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধি অ্যাডল্‌ফ জফ্ (Adolf Joffe)-এর সঙ্গে আলোচনার পর গুয়োমিন্টাং দলকে বলশেভিক পার্টির অনুরূপ সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাবেও সান সম্মত হন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই বছরই অক্টোবর মাসে **মিখাইল বোরোদিন** (Mikhail Borodin)-এর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিকের পরামর্শদাতা ক্যান্টনে আসেন এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে গুয়োমিন্টাং দলকে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। ১৯২৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় সম্মেলনে দুই দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

তৃতীয় কংগ্রেস—জোট বাঁধার নীতি

প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে স্বীকৃতি পেল। পরের বছর জানুয়ারি মাসে গুয়োমিন্টাং দলের প্রথম সম্মেলনে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কর্মসমিতিতে তিনজন কমিউনিস্ট সদস্য নির্বাচিত হন। **মাও জে দঙ** বিকল্প সদস্য (alternate member) নির্বাচিত হয়েছিলেন।

গুয়োমিন্টাং দলের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন

১৯২৩ সালেই চিনের নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টি গুয়োমিন্টাং দলের সঙ্গে জোট গঠনের প্রস্তাব করে। সান-ইয়াৎ-সেন তখন গুয়োমিন্টাং দলের সর্বাধিনায়ক। তিনি তাঁর দলের তিনটি মূল লক্ষ্য ঘোষণা করেন। লক্ষ্য তিনটি হল—(১) সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন; (২) চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জোটগঠন; এবং (৩) শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন। এই তিনটি লক্ষ্য ঘোষণা করা ছাড়াও সান-ইয়াৎ-সেন তাঁর আগের তিনটি নীতির অর্থ পালটে নতুন করে ব্যাখ্যা করেন। **প্রথমত,** জাতীয়তাবাদ বলতে আগে তিনি মাঞ্চু রাজাদের বিরোধিতার কথা বলতেন, নতুন অর্থে জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য হল, সব ধরনের সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি। **দ্বিতীয়ত,** গণতন্ত্রের ধারণাটিকে নতুন করে ব্যাখ্যা করে সান ঘোষণা করেন, গণতন্ত্র মানে পশ্চিমি দেশগুলির মতো বুর্জোয়া শ্রেণির একাধিপত্য নয়, প্রকৃত জনগণের শাসন। **তৃতীয়ত,** সবার জন্য জীবনধারণের সুযোগের নীতিটির অর্থ অনেকটা অপরিবর্তিত রেখেই বলা হোল, এই নীতিটির মূল কথা **"যে চাষ করবে জমির মালিক সেই হবে।"**

এই নীতিগুলি মার্কসবাদী নীতি নয় এবং সান-ইয়াৎ-সেন-ও মার্কসবাদী হয়ে যাননি। গুয়োমিন্টাং দলের যে লক্ষ্য তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তাতে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়নি। তাছাড়া, বিভিন্ন শ্রেণির অবস্থান ও ভূমিকা এবং শ্রেণিসংগ্রামের কথাও ছিল না। কিন্তু এই লক্ষ্য ও নীতির মধ্যে এমন কতকগুলি প্রস্তাব ছিল যা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবের, অর্থাৎ, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি। শ্রমিক, কৃষকদের কাছে এবং মুৎসুদ্দি নয় এমন ছোটো ছোটো শিল্পপতিদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও গুয়োমিন্টাং দলের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে সামনে রেখে।

গুয়োমিন্টাং দল ও কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তফ্রন্ট মাত্র তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই সময় ক্যান্টনে গুয়োমিন্টাং দলের নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক শিক্ষার জন্য একটি মিলিটারি অ্যাকাডেমি স্থাপিত হয়—এটি **হোয়ামপোয়া মিলিটারি** অ্যাকাডেমি (Whoampoa Military Academy) নামে পরিচিত। উদ্দেশ্য ছিল, নতুন ধরনের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি জাতীয়তাবাদী ও আঞ্চলিকতা-বিরোধী সৈন্যবাহিনী গঠন। সান-ইয়াৎ-সেন-এর প্রধান সহকর্মী এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয় **চিয়াং কাই-শেক** এই অ্যাকাডেমির প্রধান হন; কমিউনিস্ট নেতা **ঝৌ আন লাই** হন রাজনৈতিক অধিকর্তা। ক্যান্টন সরকারের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর চিনের বিভিন্ন প্রদেশে। শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন নতুন করে উদ্দীপিত হয়েছিল। সমগ্র দেশ জুড়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নতুন জোয়ার দেখা গেল। এই সময়ে—১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে—বেইজিং-এর সরকারি বাহিনীর একজন খ্রিস্টধর্মীয় সেনানায়ক **ফেন ইউ শিয়াং** বিদ্রোহ ঘোষণা করে বেইজিং দখল করে নেয়। যার ফলে, রাষ্ট্রপতি **জাও কুং** এবং আঞ্চলিক সামরিক নেতা **উ পেইফু**-র শাসনের অবসান ঘটে। সব মিলিয়ে সংকটাপন্ন বেইজিং সরকার দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান

করে। সান-ইয়াৎ-সেন আমন্ত্রিত হয়ে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল, দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত একটি জাতীয় আইনসভা গঠন করতে হবে। প্রস্তাবটি খুব একটা সমর্থন পায়নি। বেইজিং-এ সান-ইয়াৎ-সেন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দুরারোগ্য ক্যানসার ব্যাধিতে ১৯২৫ সালের ১২ মার্চ তাঁর জীবনাবসান হয়। সান-ইয়াৎ-সেন-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন চিয়াং কাই-শেক।

বিপ্লবী প্রথম গৃহযুদ্ধ

সান-ইয়াৎ-সেন-এর মৃত্যুর এক বছর পরে (১৯২৬ সালে) প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ক্যান্টনের জাতীয় সরকার উত্তরদিকে অভিযান শুরু করে। এই অভিযানে হোয়ামপোয়া অ্যাকাডেমি-র ছাত্রদের (Cadet) নিয়ে গঠিত জাতীয় বিপ্লবী বাহিনীর ইন্ডিপেন্ডেন্ট রেজিমেন্ট অংশ নিয়েছিল। এই রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন একজন কমিউনিস্ট, **ইয়ে তিং** (Yeh Ting)। এর আগেই সাংহাই শহরে সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে ১৯২৫ সালের ৩০ মে ছাত্ররা রাস্তায় নামলে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী অজস্র গুলিবর্ষণ করে। সাংহাই শহর-এর নানজিং রোড রক্তে ভেসে গিয়েছিল। এই ঘটনা **"৩০ মে-র ম্যাসাকার"** নামে পরিচিত। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতা তুঙ্গে উঠেছিল। কুয়াং টাং-এর সংগ্রামী কৃষকরা ওই অঞ্চলে একটি বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে তোলে, যা সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সন্ত্রস্ত করেছিল। এই পরিস্থিতিতে উত্তরাভিমুখী সামরিক অভিযানের সাফল্য সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনকে আরও উজ্জীবিত করে তুলেছিল। জনতার চাপে জাতীয় সরকার হ্যাংকাও ও কিউকিয়াং-এ দুটি ব্রিটিশ ঘাঁটি দখল করে নেয়। সাংহাই-এর শ্রমিকরা আবার ব্যাপক ধর্মঘটে শামিল হয়, **লিউ শাওকি** ছিলেন এই শ্রমিক আন্দোলনের নেতা। পাশাপাশি হুনান-এ মাও জে দঙ্-এর নেতৃত্বে প্রায় ২০ লক্ষ কৃষক একটি বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরি করে। এই সময় বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব কমিউনিস্টদের হাতে চলে যাচ্ছে দেখে চিয়াং কাই-শেক আতঙ্কিত হয়ে কমিউনিস্টদের আক্রমণ করা শুরু করেন। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সহযোগিতায় সর্বত্র কমিউনিস্টদের এমনকি তাদের পরিবারবর্গের নিধন শুরু হয়ে যায়। ফলে গুয়োমিন্টাং এবং কমিউনিস্ট দলের মধ্যে যে আঁতাত সান-ইয়াৎ-সেন-এর নেতৃত্বকালে গড়ে উঠেছিল, তা ভেঙে গেল। চিনের বিপ্লবী আন্দোলন নতুন মোড় নিল।

১ জাতীয় গণকংগ্রেসের গঠন, ক্ষমতা ও মর্যাদা

Composition, Powers and Position of NPC

গণ সাধারণতান্ত্রিক চীনের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সংস্থা হল জাতীয় কংগ্রেস। এর গঠন ও ক্ষমতার কিছু লক্ষ্যণীয় বিশেষত্ব আছে।

গঠন

Composition

জাতীয় গণকংগ্রেস একটি বিশাল আয়তন-বিশিষ্ট এক-পরিষদীয় আইনসভা। বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতির ও জাতীয় জনসমাজের প্রতিনিধিরা গণকংগ্রেসের মধ্যেই স্থান লাভ করেন। বিভিন্ন প্রদেশ, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন পৌরসভাগুলির গণকংগ্রেস এবং সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (যাদের ডেপুটি বলা হয়) নিয়ে তা গঠিত। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৪৯৭ জন, ষষ্ঠ কংগ্রেসে ছিল ২৯৭৭ জন।

নির্বাচন ঃ ডেপুটিগণ নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন না, তাঁরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। নিম্নতন সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা গণকংগ্রেসের ডেপুটিদের নির্বাচিত করেন। ডেপুটিগণ নিজ নিজ গণকংগ্রেস থেকে গণতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনার পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। নির্বাচকগণ কোন ডেপুটির কাজকর্মে সন্তুষ্ট না হলে তাঁকে আইনানুযায়ী অপসারণ (recall) করতে পারে।

সদস্যদের যোগ্যতা ঃ জাতীয় গণকংগ্রেসের ডেপুটি হতে গেলে বিশেষ কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। ১৮ বৎসর বয়স্ক যে কোন ভোটদাতা ডেপুটি পদের প্রার্থী হতে পারেন।

কার্যকাল ঃ জাতীয় গণকংগ্রেসের কার্যকাল ৫ বৎসর। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির ২/৩ অংশের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে জাতীয় গণকংগ্রেসের কার্যকাল বৃদ্ধি করা যাবে।

অধিবেশন ঃ জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন বৎসরে একবার হয়ে থাকে। এই অধিবেশন আহ্বান করে তার স্থায়ী কমিটি। তবে স্থায়ী কমিটি প্রয়োজন মনে করলে কিংবা জাতীয় গণকংগ্রেসের এক-পঞ্চমাংশের অধিকসংখ্যক ডেপুটি প্রস্তাব পাশ করলে এর অধিবেশন যে কোন সময় আহ্বান করা যেতে পারে।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী

Powers and Functions

জাতীয় গণকংগ্রেসকে সংবিধান চীনের "সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সংস্থা" ("highest organ of state power") রূপে অভিহিত করেছে। এটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার আধার এবং সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থা এর কাছে দায়িত্বশীল। এর ক্ষমতা ও কাজকে নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবিভাগ করে

আলোচনা করা হল :

(১) **আইন প্রণয়ন :** জাতীয় গণকংগ্রেস চীন রাষ্ট্রের সার্বভৌম আইনপ্রণয়নকারী সংস্থা। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে জাতীয় গণকংগ্রেস এবং তার স্থায়ী কমিটি। তবে জাতীয় গণকংগ্রেস আইনের মৌলিক নীতিগুলি স্থির করে এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি ও অন্যান্য বিষয়ে মৌলিক আইনগুলি প্রণয়ন করে এবং এদের সংশোধন করে থাকে।

(২) **সংবিধানের সংশোধন :** জাতীয় গণকংগ্রেসই চীনের সংবিধান সংশোধনের অধিকারী। জাতীয় গণকংগ্রেসের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ডেপুটিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংবিধানের সংশোধন করা যায়।

(৩) **শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ :** দেশের বিভিন্ন শাসন সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় গণকংগ্রেস। এটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন করে থাকে : যেমন, (ক) রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি, (খ) রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন ক্রমে রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধান মন্ত্রীকে এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রীয় পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের, (গ) কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যানকে, (ঘ) সর্বোচ্চ গণ-আদালতের সভাপতিকে এবং (ঙ) গণ প্রকিউরেটরেটের প্রকিউরেটর জেনারেলকে, এবং আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন করবার ক্ষমতা একমাত্র জাতীয় গণকংগ্রেসের। আবার এইসকল পদাধিকারী ব্যক্তিদের অপসারণ করার ক্ষমতাও গণকংগ্রেসের।

জাতীয় গণকংগ্রেস তার বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কর্মচারীদের কাজকর্ম তদারকি করে থাকে। এর ডেপুটিগণ এবং স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ রাষ্ট্রীয় পরিষদকে কিংবা রাষ্ট্রীয় পরিষদের বিভিন্ন মন্ত্রক ও কমিশনগুলিকে যে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন এবং তারা দায়িত্বের সঙ্গে ঐ সকল জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর দিতে বাধ্য। রাষ্ট্রীয় পরিষদ, সর্বোচ্চ গণ-আদালত ও সর্বোচ্চ গণপ্রকিউরেটরেট তাদের কাজকর্মের জন্য জাতীয় গণকংগ্রেসের নিকট দায়িত্বশীল এবং জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ থাকলে তার স্থায়ী কমিটির নিকট দায়িত্বশীল থাকে। আবার স্থায়ী কমিটিই তার সকল কাজের জন্য জাতীয় গণকংগ্রেসের নিকট দায়িত্বশীল।

জাতীয় গণকংগ্রেসের শাসন সংক্রান্ত আর একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা হল : বিভিন্ন প্রদেশ, স্বশাসিত অঞ্চল, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন পৌরসভা বা বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল গঠন করতে গেলে গণকংগ্রেসের অনুমোদন চাই।

(৪) **অর্থবিষয়ক কাজ ও ক্ষমতা :** জাতীয় গণকংগ্রেস দেশের আর্থিক নীতি নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। এটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা পরীক্ষা করে দেখে, অনুমোদন করে এবং পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্পর্কে বিবরণী পরীক্ষা ও অনুমোদন করে থাকে। রাষ্ট্রীয় বাজেটের পরীক্ষা ও অনুমোদন করাও গণকংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থবিষয়ক কাজ। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রের চূড়ান্ত হিসাবপত্রও গণকংগ্রেস পরীক্ষা করে দেখে এবং অনুমোদন করে থাকে।

(৫) **বিদেশ নীতি সংক্রান্ত কাজ ও ক্ষমতা :** দেশের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা জাতীয় গণকংগ্রেসের। যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গণকংগ্রেস।

(৬) **শিক্ষামূলক কাজ :** দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা হিসাবে জাতীয় গণকংগ্রেসের একটি শিক্ষামূলক কাজ আছে। এটি একটি "জাতীয় মঞ্চ", যেখানে জনগণের ডেপুটিগণ সমবেত

হয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও মতামত সরকারকে জানান। ফলে সরকারের নীতি ও কর্মধারা জনগণের নিকট প্রতিভাত হয় এবং জনগণের সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটে।

জাতীয় গণকংগ্রেসের ভূমিকা ও মর্যাদা

Role and Position of NPC

উপরে বর্ণিত ক্ষমতার বিচারে এটা বলা অসঙ্গত নয় যে, চীনের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় জাতীয় গণকংগ্রেসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান অনুসারে চীনের জাতীয় গণকংগ্রেস রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা। এটি যে শুধু একটি সার্বভৌম আইনসভা তা নয়, এ শাসনবিভাগকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এর মাধ্যমেই চীনের জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই দিক থেকে এটি পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের সঙ্গে তুলনীয়।

কিন্তু চীনের সাংবিধানিক ব্যবস্থাতে **জাতীয় গণকংগ্রেসের ভূমিকার ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান দেখা যায়।** তত্ত্বগতভাবে জাতীয় গণকংগ্রেস রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা হলেও বাস্তবে এর ক্ষমতা বিভিন্ন কারণে সীমাবদ্ধ। সেহেতু এ. ডি. বার্নেট, ডি. জে. ওয়ালার, জে. আর. টাউনসেন্ড প্রমুখ পাশ্চাত্যের লেখকগণ জাতীয় গণকংগ্রেসের কার্যকারিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের যুক্তি হল : (১) জাতীয় গণকংগ্রেস একটি একদলীয় আইনসভা। দেশের শাসনব্যবস্থায় একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বদানকে সংবিধান স্বীকৃতি দিয়েছে। চীনদেশে জনজীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি। পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করেন এবং দু-একজন বাদে তাঁদের সকলেই আবার রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন পদে আসীন থাকেন। (২) জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন বৎসরে একবার হয়ে থাকে এবং মাত্র ১৫ দিনের জন্য। এই অল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যথাযথভাবে বিবেচনা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার কাজ বাস্তবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়, সরকারী নীতি ও সিদ্ধান্তের অনুমোদন ও প্রশংসা করাই এর কাজ। (৩) জাতীয় গণকংগ্রেসের অধিবেশন বৎসরে অধিকাংশ সময় স্থগিত থাকার ফলে এর কাজকর্ম সম্পাদন করে এর স্থায়ী কমিটি। প্রকৃতপক্ষে, স্থায়ী কমিটি একাধারে আইনপ্রণয়ন সংস্থা ও শাসনসংস্থা রূপে কাজ করে থাকে। স্থায়ী কমিটি সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যাকর্তা; জাতীয় গণকংগ্রেস যে সব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে, সেগুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও আইনের সংশোধন করার ক্ষমতা স্থায়ী কমিটির। (৪) গণকংগ্রেসের নিকট কেন্দ্রীয় গণসরকার আইনত দায়িত্বশীল থাকলেও এই দায়িত্বশীলতা আনুষ্ঠানিক মাত্র। কারণ গণকংগ্রেস প্রধান মন্ত্রীকে অপসারণ করতে অক্ষম এবং কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সারির নেতৃবৃন্দই রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য।

সুতরাং, সমালোচকদের মতে, দেশের শাসনব্যবস্থায় গণকংগ্রেসের ভূমিকা ও স্থান নগণ্য এবং আলংকারিকমাত্র। আধুনিক আইনসভাগুলির বিতর্কমূলক ও সমালোচনামূলক কাজ এটি করে না। নেজেল হ্যারিস জাতীয় গণকংগ্রেসকে "চীন রাষ্ট্রের বহিরঙ্গ সজ্জার একটি অংশ" রূপে অভিহিত করেছেন।

এই সমালোচনার উত্তরে বলা যায়, গণকংগ্রেসকে স্থায়ী কমিটি নিয়ন্ত্রণ করে—তা সঠিক নয়। কারণ গণকংগ্রেসের নিকট স্থায়ী কমিটি দায়িত্বশীল। স্থায়ী কমিটির কার্যকাল শেষ হবার পূর্বেই গণকংগ্রেস তার সদস্যগণকে পদচ্যুত করতে পারে। গণকংগ্রেস প্রণীত কোন আইনকে স্থায়ী কমিটি বাতিল করতে পারে না, কিন্তু স্থায়ী কমিটি যে সকল নির্দেশ জারি করে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে,

তা গণকংগ্রেস বাতিল করতে পারে। সুতরাং জাতীয় গণকংগ্রেস একটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা, এটা অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, গণকংগ্রেসকে একটি অনুমোদনকারী সংস্থা হিসাবে যে সমালোচনা করা হয়েছে, তা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্রিটেনে আইন প্রণয়ন ব্যাপারে পার্লামেন্টকে পরিচালনা করে ক্যাবিনেট। আইভর জেনিংস বলেছেন, "ব্রিটেনের ক্যাবিনেটকে কমন্সসভা নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং ক্যাবিনেটই কমন্স সভাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।" বস্তুতঃ বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও আইনসভার কাজকর্ম এর সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। লোকচক্ষুর অন্তরালে রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষত শাসক দলই আইনসভার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। ব্রিটেনে পার্লামেন্টের কাজ শুধু প্রতিবাদ করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রাষ্ট্রপতি প্রধান আইন প্রণেতা হয়ে উঠেছেন। বস্তুত বর্তমান যুগে যে কোন রাষ্ট্রেই আইনসভার ওপর শাসনবিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু চীনে আইনসভার ওপর শাসনবিভাগের চূড়ান্ত প্রাধান্য পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক দেশে দেখা যায় না। সেকারণে গণকংগ্রেসের ভূমিকা আলংকারিক বলে মনে হয়।

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় গণকংগ্রেস একটি বিতর্কসভা বা জাতীয় সমালোচনার মঞ্চ নয়—তা ঠিক, কিন্তু চীনের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে গণকংগ্রেসের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। তবে বিরোধী দলের অনস্তিত্ব এবং সরকারের নীতি-বিরোধী মত প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত না থাকায় জাতীয় গণকংগ্রেসের প্রভাব খুবই সীমাবদ্ধ। ডেপুটিদের নিজস্ব মতামত স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে বলার অধিকার স্বীকৃত হলেই গণকংগ্রেস একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক, জনগণের মুখপাত্র হয়ে উঠতে পারে। প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণকংগ্রেসকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা বলা যায় না।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র
Direct Democracy

আধুনিক রাজনীতিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সুইজারল্যান্ডের রাজনীতিক ব্যবস্থাকে প্রায়ই সর্বাধিক গণতান্ত্রিক বলে বর্ণনা করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণ হল সুইজারল্যান্ডই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা থাকলেও দেশের শাসনব্যবস্থা অনেকাংশে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ঃ গণভোট (referendum) ও গণ-উদ্যোগ (initiative)। এই দুটি ব্যবস্থার ফলে সুইজারল্যান্ডের নাগরিকগণ (১) সংবিধানের যেকোন সংশোধন অনুমোদনের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে; (২) সংবিধানের পরিবর্তন সাধনের জন্য উদ্যোগী হতে পারে; (৩) আইন প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে; (৪) জনগণের অনুমোদনের জন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি পেশ করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করতে পারে। দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের এই ধরনের সুযোগ পৃথিবীর অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশে দেখা যায় না। সেহেতু সুইজারল্যান্ড ও গণতন্ত্র — এই দুটি কথা সাধারণত একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হল সুইজারল্যান্ডের শাসনব্যবস্থার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

১ *গণভোট*
Referendum

আইনসভায় গৃহীত যেকোন আইন—সাধারণ আইন বা মৌলিক আইন—যখন ভোটের দ্বারা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের জন্য জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা হয় তখন তাকে গণভোট বলে। সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় এবং প্রত্যেক ক্যান্টনে গণভোটের ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী অধিকসংখ্যক ভোটদাতাদের অনুমোদন না পেলে আইনসভা দ্বারা গৃহীত কোন আইন বলবৎযোগ্য হয় না।

গণভোট আবার দু প্রকারের ঃ বাধ্যতামূলক (compulsory) ও ঐচ্ছিক (optional)।

(১) বাধ্যতামূলক গণভোট

সুইস্ সংবিধানের যেকোন সংশোধন — আমূল বা আংশিক — জাতীয় গণভোটে পেশ করতে হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভৌটদাতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যান্টনের অনুমোদন না পেলে সংশোধন কার্যকর হয় না। সংবিধানের আমূল বা আংশিক সংশোধনের জন্য কোন প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রীয় সভা সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে আনতে পারে। কিন্তু প্রস্তাবটি জনসাধারণের নিকট পেশ করতে হবে এবং গণভোটে অংশগ্রহণকারী ভোটদাতাদের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করলেই সংশোধন কার্যকর হবে।

যদি আইনসভার একটি কক্ষ সংবিধানের আমূল সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং অপর কক্ষ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সংবিধানের সংশোধন করা হবে কিনা এই প্রশ্নটি গণভোটে দেওয়া হয়। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতা সংশোধনের বিরুদ্ধে ভোট দেয়, তাহলে সমস্যার সেখানেই সমাপ্তি ঘটে। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতা সংশোধন করার সমর্থনে ভোট দিলে

আইনসভাকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন হয়। নতুন আইনসভাকে আমূল সংশোধনের প্রস্তাব একটি বিলের আকারে জনসাধারণের ও ক্যান্টনগুলির মতামতের জন্য পেশ করতে হবে। যদি অধিকসংখ্যক ভোটদাতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যান্টন বিলটি অনুমোদন করে, তাহলে সংবিধানের আমূল সংশোধন কার্যকর হবে।

(২) ঐচ্ছিক গণভোট

সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কে গণভোটের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক।

২ *গণ-উদ্যোগ*
Initiative

সংবিধানে স্বীকৃত গণ-উদ্যোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে এক নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটদাতা সংবিধানের সংশোধনের জন্য বা কোন আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব দিতে পারে এবং তার উপর গণভোটের দাবি করতে পারে। এই অস্ত্রটির ব্যবহার করে জনসাধারণ আইনসভাকে কোন আইন প্রণয়নে বাধ্য করতে পারে। তবে সুইস্ সংবিধান কেন্দ্রীয় আইনের ক্ষেত্রে গণ-উদ্যোগ স্বীকার করে নি। কেবলমাত্র সুইস্ সংবিধানের সম্পর্কে গণ-উদ্যোগে প্রযোজ্য। তবে ক্যান্টনের সংবিধানগুলিতে আইনের প্রস্তাব বা ক্যান্টনীয় সংবিধানের সংশোধন সম্পর্কে গণ-উদ্যাগ স্বীকার করা হয়েছে।

সুইস্ সংবিধান অনুযায়ী ৫০ হাজার ভোটাদাতা সংবিধানের আমূল বা আংশিক সংশোধনের জন্য লিখিতভাবে দাবি উত্থাপন করতে পারে। সংশোধনী প্রস্তাবটি সাধারণ আকারে উত্থাপন করা যায় অথবা একটি সম্পূর্ণ বিলের আকারে উত্থাপন করা যায়।

সাধারণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষের অনুমোদন থাকলে ঐ সভা প্রস্তাব অনুযায়ী একটি খসড়া বিল প্রস্তুত করে সেটি জনসাধারণ ও ক্যান্টনগুলির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করে। আর, ভোটারদের উত্থাপিত প্রস্তাব আইনসভায় অনুমোদিত না হলে, সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত প্রশ্নটি গণভোটে দেওয়া হয়। অধিকসংখ্যক ভোটদাতা সংশোধন করার সমর্থনে ভোট দিলে আইনসভা একটি খসড়া বিল প্রস্তুত করে এবং গণভোটে ও ক্যান্টনগুলির নিকট পেশ করে। অধিকসংখ্যক ভোটদাতা ও অধিকসংখ্যক ক্যান্টন বিলের পক্ষে ভোট দিলে, সংবিধানের সংশোধন কার্যকর হয়।

যদি ৫০,০০০ ভোটদাতা সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব একটি সুনির্দিষ্ট বিলের আকারে উপস্থিত করে, তবে আইনসভা নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে যে-কোন একটি পন্থা গ্রহণ করতে পারে : (১) বিলটি আইনসভার অনুমোদন লাভের পর জনসাধারণের নিকট ও ক্যান্টনগুলির নিকট মতামতের জন্য পেশ করবে; (২) বিলটি আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না পেলে বিলটিকে প্রত্যাখ্যানের জন্য সুপারিশসহ গণভোটে দিতে পারে; (৩) মূল বিলের বিকল্প একটি বিল জনসাধারণের সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থিত করতে পারে।

সুতরাং সুইজারল্যান্ডের সংবিধান কোন অবস্থাতেই জনসাধারণের ও ক্যান্টনগুলির সুস্পষ্ট সমর্থন ছাড়া সংশোধিত হতে পারে না।

৩ *গণসমাবেশ*
Landsgemeinde

সুইস্ ক্যান্টনগুলিতে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল গণসমাবেশের

মাধ্যমে আইনপ্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা। অর্থাৎ ৩০ হাজার নাগরিক অথবা ৮ টি ক্যান্টন দাবি করলেই কোন আইন সম্পর্কে গণভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু যে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন বা প্রস্তাব সাধারণভাবে প্রয়োজ্য নয় অথবা জরুরী প্রকৃতির, ঐ সমস্ত আইন বা প্রস্তাব সম্পর্কে গণভোট হবে না। কোন আইন বা প্রস্তাব জরুরী বা সাধারণভাবে প্রয়োজ্য কিনা, সে বিষয়ে আইন সভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অনুরূপভাবে, যে সব আন্তর্জাতিক চুক্তির মেয়াদ কমপক্ষে ১৫ বৎসর সেগুলি জন্যও গণভোট হতে পারে। দুবার তা হয়েছে। আজ পর্যন্ত ৭১ বার ঐচ্ছিত গণভোট হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ক্যান্টনগুলিতেও তাদের সংবিধানের সংশোধনের জন্য বাধ্যতামূলক গণভোটের ব্যবস্থা আছে। আবার ক্যান্টনের আইনসভা দ্বারা গৃহীত সাধারণ আইন সম্পর্কে গণভোট কোথাও বাধ্যতামূলক এবং কোথাও ঐচ্ছিক।

সুইজারল্যান্ডের ৪টি অর্ধ ক্যান্টন ও ১টি ক্যান্টনে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই সকল ক্যান্টনের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকরা উন্মুক্ত স্থানে মিলিত হয়ে আইন প্রণয়ন করে, শাসন পরিষদের সদস্য নির্বাচন করে এবং শাসন পরিষদ পূর্বেই কোন আইন প্রণয়ন করে থাকলে তা গ্রহণ বা বর্জন করে। গণসমাবেশে যেসকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তা শাসন পরিষদ প্রয়োগ করতে বাধ্য। গণ-সমাবেশে ক্যান্টনের বিচারক এবং বিভিন্ন পদস্থ সরকারী কর্মচারীও নির্বাচিত হন। লয়েড ও হবসন বলেন, গণ-সমাবেশই বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যেখানে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করে থাকে।

৪ মূল্যায়ন
Assessment

গণ-উদ্যোগ, গণভোট এবং গণ-সমাবেশ সুইজারল্যান্ডের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। এদের কেন্দ্র করেই সুইজারল্যান্ডের শাসনব্যবস্থা আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু সমালোচকগণ এই ব্যবস্থার কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, এই ব্যবস্থা আইনসভাকে দায়িত্বহীন করে তোলে। কারণ, আইনসভা জানে যে আইন প্রণয়নে তার ক্ষমতা চূড়ান্ত নয়। চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেন নাগরিকগণ। এম. ডাবসের মতে গণভোটের ফলে আইনসভা শুধুমাত্র উপদেষ্টামূলক কমিটিতে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানকালে আইন অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে। জনসাধারণের পক্ষে আইনের জটিলতা বোঝা খুবই কঠিন। তৃতীয়ত, গণভোট ও গণ-উদ্যোগের ব্যবহার সুইস্ নাগরিকরা খুবই কম করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণ-উদ্যাগের মাধ্যমে উত্থাপিত প্রস্তাব গণভোটে বাতিল হয়ে গেছে। পরিশেষে, এই ব্যবস্থা খুবই ব্যয়বহুল।

এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সুইজারল্যান্ডের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রশংসা না করে পারা যায় না। অধ্যাপক মুনরো বলেন, "এর ত্রুটি অপেক্ষা সুবিধার পরিমাণ অনেক বেশী"। এই ব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের প্রকৃত সুযোগ সৃষ্টি করে জনসাধারণের দায়িত্বশীলতা একদিকে যেমন বৃদ্ধি করেছে, অপরদিকে শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্বশীলতা বাস্তবে কার্যকর হয়েছে।